কোন পথে গেল গান

কবীর সুমন

কোন পথে গেল গান ■ কবীর সুমন

ISBN 81-7990-061-4

কোন পথে গেল গান

কবীর সুমন

আজকাল

কোন পথে গেল গান

Kon Pathe Gelo Gaan—a discourse by Kabir Suman

প্রথম প্রকাশ

কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৬ / মাঘ ১৪১২

প্রচ্ছদ

দেবব্রত ঘোষ

ISBN-81-7990-052-5

© লেখক

প্রকাশক ও মুদ্রক

জ্যোতিপ্রকাশ খান

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৯৬ রাজা রামমোহণ সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণ

ইউনিক কালার প্রিন্টার, ২০এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

পরিবেশক

দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

৬০ টাকা

উৎসর্গ

শ্রী অলক চট্টোপাধ্যায়

শ্রী শচীদুলাল দাস

'Remember, I lived for music.

Leonard Cohen

গবেষণাগ্রন্থ লেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। অগ্রজপ্রতীম সাংবাদিক ও বাংলাগানপ্রেমী শ্রী অলক চট্টোপাধ্যায় আমায় বলেছিলেন ২০০৫ সালের শারদীয় আজকালের জন্য একটি লেখা লিখতে। লেখাটির নামও তিনিই রেখেছিলেন: কোন পথে গেল (শ্যাম নয়) গান। সেই সঙ্গে আমার পেছনে খাড়া করে রেখেছিলেন নিয়মিত তাগাদা নামে একটি বস্তু। ফলে খুব অল্প সময়ে তৈরি করে ফেলেছিলাম লেখাটি। ছাপার পর পাঠকরা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছিলেন তাড়াহুড়োর মূল্য আমায় দিতে হয়েছে অন্তত একটি ব্যাপারে— পুনরাবৃত্তি। এই প্রমাদ দু'একটি জায়গায় ঘটেছে। পরে আজকাল প্রকাশনী জানালেন এই লেখাটিই তাঁরা বই আকারে বের করতে চান। তবে হ্যাঁ, এবারে তাঁরা একটু সময় দিলেন সেরকম বুঝলে আরও কিছু যোগ করার, অল্পবিস্তর ঘষামাজা করার। তাঁরা এও জানালেন যে পুরো লেখাটা আমি যদি চাই এমনকি ঢেলে সাজাতেও পারি। ঢেলে সাজানো মানে নতুন করে লেখা। আমি ভেবে দেখলাম— নতুন করে লিখতে গেলে ২০০৫-এর দুর্গাপুজো (যে সময়ে 'শারদীয়' সংখ্যাগুলি বেরোয়) আর আসছে বইমেলার জন্য বই তৈরি করে ফেলার চূড়ান্ত সময়সীমা অর্থাৎ বড়জোর নভেম্বরের শেষের মধ্যে যে সময়টুকু পাওয়া যাবে তা যথেষ্ট নয়। বছরখানেক সময় পেলে এইরকম বিষয়ে একটা জুৎসই বই তবু লেখার কথা ভাবা যায়। তখন রচনা-আঙ্গিক করে তোলা যায় মেদহীন, বিষয়ের পরম্পরা করে তোলা যায় আরও যথাযথ। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে দেখলে— কোনও পাঠ্যবই বা গবেষণাগ্রন্থ লেখা তো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। সেই উদ্দেশ্য এখনও নেই। সেরকম লোকই আমি নই। ১৯৬৯ সালে বি এ পাশ করার পর এম এ পড়তে পড়তে সেই যে লেখাপাড়া ছেড়ে কর্মক্ষেত্রে ঢুকেছি তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার মাড়াইনি আর। গবেষণা করা, সেই গবেষণার ভিত্তিতে মাপজোক করে প্রমাণ আকারের বই লেখা কাকে বলে জানি না। সেই শিক্ষাই আমার নেই। শ্রী অলক চট্টোপাধ্যায়ের খোঁচায় হুট করে যা লিখতে শুরু করে দিয়েছিলাম সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা তাৎক্ষণিকতা ছিল, ছিল সাত-দিনে-লিখে-ফেলতেই-হবের তাড়া (তাঁর দিক থেকে) আর সঙ্কল্প (আমার দিক থেকে)। এইভাবে দুনিয়ায় লেখালেখির বাইরেও বেশ কিছু কাজ

হয়েছে। এরও একটা আলাদা স্বাদগন্ধ, মেজাজ আছে। নতুন করে লিখতে গেলে সেই মেজাজটা থাকত না। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতায় ছিল— 'তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই'। শারদীয় আজকালের এই লেখাটির উদ্দেশ্যও ছিল সেই রকমই। যে বইটির জন্য এই ভূমিকা লিখছি সেটিরও উদ্দেশ্য তো একই। তাহলে আর কেঁচে গণ্ডুষ করা কেন? বিষয়টি এমন এবং এই বিষয়ে বাংলা বা অন্য কোনও ভাষায় লেখা এত কম হয়েছে যে বাংলা পড়ে বুঝতে পারেন এমন পাঠকের কাছে এটি প্রথমত হাজির করাই একটা বড় কাজ। মাপজোক নিয়ে, হিসেব করে, সবকিছুর প্রতি সুবিচার করে এই কাজটাই করতে গেলে (আগেই বলেছি) অনেক সময় দরকার। তবে না সুনির্মিত কাজের বিশেষ আবেদনটি পাওয়া যায়। তখন কাজটিকে করে তোলা যায় বাহুল্যবর্জিত, সুসম্বদ্ধ, টানটান, এমনকি সংক্ষিপ্ত। এক বিখ্যাত ইউরোপীয় সঙ্গীতকারের কাছে তাঁর প্রেমিকা নাকি আদর করে বলেছিলেন তাঁর জন্য এক রাত্তিরে একটি ছোট্ট 'সোনাটা' (Sonata) রচনা করে ফেলতে। সারারাত কাজ করে সকাল বেলায় সেই সঙ্গীতকার তাঁর প্রেমিকাকে ছোট্ট নয় বিশাল একটি রচনার স্বরলিপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সঙ্গে একটি চিরকুটে লিখে দিয়েছিলেন (যে ভাষায় ঘটনাটির কথা পড়েছি সেই ভাষাতেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি, নয়ত রসের ব্যাঘাত ঘটতে পারে): 'Darling, I didn't have enough time to be brief.'

দেখবেন, কেউ যেন আবার প্রকাশককে দোষ দেবেন না তাঁরা আমায় লেখার জন্য অনেকটা সময় দেননি বলে। তাহলে ওই সঙ্গীতকারের প্রেমিকাকেও তো দোষ দিতে হয়। যথেষ্ট বা তার চেয়েও বেশি সময় পেলে লেখাটি হয়ত আরও টানটান হত। কিন্তু আমি যেহেতু রীতিদুরস্ত গবেষক বা কোনও প্রতিষ্ঠান-স্বীকৃত গবেষণা গ্রন্থপ্রণেতা নই তাই আমার লেখা বই, আঙ্গিক একটু অন্যরকম হলেও, সব মিলিয়ে খুব আলাদা কিছু হত বলে মনে হয় না।

দীর্ঘকাল একাধিক দেশে বেতার সাংবাদিকতা করেছি। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখে গিয়েছি সেই ১৯৭৬ সাল থেকে। প্রথমে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের নামে, তারপর মানব মিত্র নামে বছর আষ্টেক। তারপর আবার সুমন চট্টোপাধ্যায় নামেও লিখেছি। এই আজকাল থেকেই বেরিয়েছিল আমার লেখা 'হয়ে ওঠা গান'। ২০০০ সালে আমি ভারতের আইন মোতাবেক এফিডেভিট করে এবং কলকাতার একটি ইংরেজি ও একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় যথাবিহিত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আমার নাম পরিবর্তন করি। তখন থেকে আমি কবীর সুমন। এছাড়া অন্য কোনও নাম আমার নেই, তা থাকতেও পারে না যেহেতু প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে এফিডেভিট করে আমি এই নতুন কমিটি নিয়েছি। ঠিক যেমন মহম্মদ আলি। কেউ তাঁকে ভুলেও আর কেসিয়াস ক্লে বলে না, বলার কথাও নয়। সেটাই স্বাভাবিক।

১৯৯৩ সালের শারদীয় আজকালে বেরিয়েছিল আমার আত্মজীবনীমূলক

লেখা 'হয়ে ওঠা গান'। পরের বই মেলায় তা বই আকারেও প্রকাশিত হয়। লেখাটির বিস্তার ছিল আমার ছেলেবেলা থেকে ১৯৯২ সালে আমার স্বরচিত গানের প্রথম এলবাম 'তোমাকে চাই'-এর প্রকাশকাল পর্যন্ত। এমন হতেই পারে যে 'হয়ে ওঠা গান' পড়েননি এমন কেউ কেউ হয়ত 'কোন পথে গেল গান' বইটি পড়বেন। কে লিখছে বইটি? সঙ্গীত, বাংলা গান সম্পর্কে কিছু বলার বা লেখার অধিকার তার কতটা আছে বা আদৌ আছে কি? স্বাভাবিক কৌতূহল থেকেই এ-ধরনের প্রশ্ন তাঁর মনে আসতে পারে। তাই নিজের সম্পর্কে অল্প কিছু কথা এই ভূমিকায় লিখছি। ২০০৫ সালের শারদীয় আজকালে 'কোন পথে গেল গান' লিখতে গিয়ে আমার আকাশবাণীর অভিজ্ঞতা ও গান বাঁধার শুরু ইত্যাদি প্রসঙ্গে লিখেছিলাম পাঠকের পরিপ্রেক্ষিত চিন্তার কথা ভেবে। সেই অংশগুলি এই বইতে থেকে গেল। নিচের কথাগুলি থেকে 'হয়ে ওঠা গান' লেখাটি যাঁরা পড়েননি তাঁদের বুঝতে সুবিধে হবে গানবাজনায় আমার হয়ে ওঠা কেমনধারা ছিল।

বাল্যকালেই আমার সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হয়ে যায়। প্রয়াত কালীপদ দাসের কাছে আমি ১৪ বছর খেয়াল শিখতে চেষ্টা করি। বাংলা আধুনিক গান, রবীন্দ্রনাথের গান, কাজি নজরুল ইসলামের গান, হিমাংশু দত্তর গান (সবই আসলে আধুনিক বাংলা গান) আমি শিখতে চেষ্টা করেছি সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নীহারবিন্দু সেন, নিখিলচন্দ্র সেন, মণি চক্রবর্তীর কাছে। এঁদের কেউই আর নেই। ১৯৬৬ সালে একবার আকাশবাণীর একটি কাজে সঙ্গীতাচার্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে ভজন শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। ১৯৭১ সালে আকাশবাণীরই একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে পঙ্কজ কুমার মল্লিকের পরিচালনায় মাসাধিক মহলা দিয়ে স্টুডিও-রেকর্ড করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলাম। ১৯৭২ সালে প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড করার সময় ভাগ্যে জুটেছিল সুবিনয় রায়ের প্রশিক্ষণ। পাশ্চাত্য কণ্ঠসঙ্গীতের তালিম আমি নিয়মিত আলাদাভাবে পাইনি। কিন্তু কৈশোরে কলকাতার একটি স্কুলে এক সঙ্গীতজ্ঞ পর্তুগীজ-ভারতীয় ফাদারের কাছে একটি ইংরেজি অপেরায় প্রধান একটি ভূমিকায় অভিনয় করার তালিম পেয়েছিলাম রীতিমতো, কয়েক মাস ধরে। অপেরা, কাজেই গান। নানান দৃশ্যে, নানান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের গানের মধ্যে দিয়ে সংলাপ, গানের মধ্যে দিয়েই অভিনয়। সেই সঙ্গে সেই সংলাপ-গানগুলি মঞ্চে কিভাবে অভিনয় করে গাইতে হবে তারও শিক্ষা, অর্থাৎ অপেরা-অভিনয়। ১৯৮৬ সালে আমি জার্মানির কোলোন শহরে এক ইতালীয় গুরুর কাছে ক্লাসিকাল গিটারের পাঠ নিতে শুরু করেছিলাম।

গানবাজনা শুনছি বোধহয় জ্ঞানকর্ণ ফোটারও আগে থেকে। ভাগিস সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও উমা ভট্টাচার্যর (চট্টোপাধ্যায়) ছেলে হয়ে জন্মেছিলাম। তাই আমার স্মরণাতীত কাল থেকেই শুনেছি বাবা মা গান গাইছেন বা হঠাৎ গান গেয়ে উঠছেন, গুনগুন করছেন, গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাচ্ছেন, রেডিওয় গান

শুনছেন ও শোনাচ্ছেন। সব ধরনের গান ও বাজনা। শুনতে আর গুনগুন করে হলেও গাইতে যদি ভাল লাগে তা হলেই হল। আমার মাকে আমার কৈশোরে রবির সুরে মহম্মদ রফির গাওয়া 'চৌধবি কা চাঁদ' গানটি গুনগুন করতে শুনেছি। বাবা মাঝেমাঝেই আমার বড়ভাইকে বলতেন, হেমন্তর সুরে 'এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিনু' গানটা একবার গা তো। আমায় বলতেন, মান্নাবাবুর সুরে 'ও আমার মন যমুনার অঙ্গে অঙ্গে'টা একবার গাইতে চেষ্টা কর। আমার কৈশোরে আমার মা প্রায়ই আমার কাছে মহম্মদ রফির গাওয়া 'এ জীবনে যদি আর কোনও দিন দেখা হয় দুজনার' মান্না দের গাওয়া 'একই অঙ্গে এত রূপ দেখিনি তো আগে' এইসব গান শুনতে চাইতেন। এঁরা দুজনই আমার জন্মের আগে রবীন্দ্রনাথের গান, হিন্দি ভজন রেকর্ড করতেন। চলচ্চিত্রের নেপথ্যশিল্পী হিসেবে আমার বাবা রবীন্দ্রনাথের গান, হিমাংশু দত্তর গান ও অন্য রচয়িতাদের গান রেকর্ড করেছিলেন। কান আর মন দুটোই ছিল তাঁদের বরাবর খোলা। সঙ্গীত নিয়ে আমাদের পরিবারে কোনও শুচিবায়ুগ্রস্ততা, একগুঁয়েমি বা শিবিরভজা বেরসিকপনা ছিল না। তেমনি, আমাদের শোনার অভিজ্ঞতায় গানের চেয়ে বাজনার ভূমিকা কম ছিল না কোনও অংশেই। আমার ক্ষেত্রে তো যন্ত্রসঙ্গীতের ভূমিকা আমার জ্ঞানকর্ণ ফোটার সময় থেকেই আরও বড়। ছেলেবেলায় দেখেছি আমার বাবা, এমনিতে মহা রাশভারি মানুষ, মাউথ অর্গ্যান বা হারমোনিকা বাজাচ্ছেন। আমার দাদা আর আমিও বাজাতাম। আমি আজও বাজাই। যে মানুষ দাবি করেন যে তিনি শুধু গান শোনেন, বাজনা শোনেন না বা যন্ত্রসঙ্গীত ভালবাসেন না, তিনি আসলে গানও শুনতে জানেন না। আসলে তিনি সঙ্গীত ভালবাসেন না, সুরতালছন্দ তাঁকে বলে না কিছুই। বাংলা গানের দুর্ভাগ্য যে এই গানের দুনিয়ায় ভাল কণ্ঠশিল্পী যেমন এসেছেন, তেমনি এসেছেন ভাল যন্ত্রশিল্পী, অথচ যন্ত্রশিল্পীদের কথা, বাংলা গানে যন্ত্রসঙ্গীতের প্রয়োগের কথা কেউ বলেনইনি তেমন। অর্থাৎ 'সঙ্গীত' হিসেবে বাংলা গান কজন শুনেছেন সেটাই প্রশ্ন। ফলে বাংলায় যে ভাল সুরকাররা এসেছেন তাঁদের অবদানও আসলে বিশেষ আমল পায়নি। সঙ্গীতের কান যদি না থাকে তাহলে কোনও সুরকারের কী বৈশিষ্ট ও কৃতিত্ব সেটাই বা কে বুঝবে।

বাংলা গান শোনা আমাদের সমাজে বরাবরই একপেশে। ফলে, কালক্রমে কিছু জনপ্রিয় গায়ক গায়িকা ও তাঁদের স্মৃতি ঘিরেই আমাদের গানপ্রেম আবর্তিত। সেই সঙ্গে 'আমি বাপু রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া কিছু শুনি না', 'আমি বাবা রবীন্দ্র-নজরুল-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তর বাইরে কিছু মানতে রাজি নই', 'আধুনিক বটে সলিল চৌধুরি, আর কেউ দাঁড়াতে পারে?' গোছের বেরসিক, একদেশদর্শী, সুরবধির মানসিকতার শুধু বহির্প্রকাশই নয়, সগর্ব উচ্চারণ। অনেকে আবার এ নিয়ে লেখালিখিও করেছেন। তিনের দশকের আগে থেকে বাংলা গান ও আধুনিক বাংলা গানের জগতে ধারাবাহিকভাবে যেসব কাজ হয়ে এসেছে, অনেক কলমধারী পণ্ডিত সেগুলির মধ্যে থেকে পরমহংসের মতো ছেঁকে নিয়েছেন

তাঁদের পছন্দসই অমুক-সঙ্গীত বা তমুকগীতি। কয়েক দশক আগে কলকাতার কিছু বিদ্দজ্জন হঠাৎ মেতে উঠেছিলেন নিধুবাবুর টপ্পা ও বৈঠকী গান নিয়ে। অন্যদিকে এঁরাই আবার রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কিছুই মানেন না। তাঁদের মগজে ঢোকেনি রবীন্দ্রনাথ নিজেই বৈঠকী গানের সাবেকি স্থূলতামিশ্রিত বৈশিষ্টের বিপরীতে পরিশীলিত আধুনিক বাংলা গান তৈরি করতে চেষ্টা করে গিয়েছেন সারা জীবন। এমনিতে যাঁরা পদ্যে রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে হঠাৎ ঈশ্বর গুপ্তকে নতুন করে আবিষ্কার করার কথা ভুলেও ভাবেন না, তাঁরাই ব্রতী হয়েছিলেন বৈঠকী গানের তালঠোকা 'সাবেকিয়ানায়' ফিরে যেতে ('সাবেকিয়ানা' কথাটি রবীন্দ্রনাথই ব্যবহার করেছিলেন তাঁর অন্তত একটি প্রবন্ধে)। ইতিমধ্যে বাংলা আধুনিক গানে যে কী অসামান্য সব সুরকার ও শিল্পী এসে গিয়েছেন, সৃষ্টি করে গিয়েছেন তার খবর বাংলার অনেকে 'শিক্ষিত', 'সংস্কৃতিবান' মানুষ মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি। আসলে সেই ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না, কারণ আদতে তাঁরা সুর-বধির, ছন্দ-বধির।

আধুনিক বাংলা গানকে বাঁচতে হয়েছে গানবাজনার বাজারে, সাধারণ মান শ্রোতার ভাল লাগায়। একটি শিল্পরূপ হিসেবে আধুনিক বাংলার সমাজে, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জীবনে তার অবস্থান, আধুনিক বাঙালির সাঙ্গীতিক-সাংস্কৃতিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক উচ্চারণ হিসেবে তার ভূমিকা এসব নিয়ে কোনও আলোচনাই যেমন শিক্ষিত সমাজে হয়নি, তেমনি হয়নি এই গান-রূপের সাঙ্গীতিক বিশ্লেষণ। অথচ, জনপ্রিয় গান, লঘু সঙ্গীত দিয়ে একটি সমাজ ও জাতিকে যে কোনও সময়ে ও যুগমুহূর্তে যতটা ভাল চেনা যায় অন্য অনেক কিছু দিয়েই তা যায় না। আরও অনেক ক্ষেত্রের মতো এই ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণামূলক কাজ হয়ে আসছে, আজও হয়ে চলেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে তা এখনও শুরুই হল না। আশ্চর্য, আধুনিক বাংলা গানের আবেদনকে কিন্তু আমরা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এড়াতে পারি না। এই দ্বন্দ্বের ফল বর্তেছে আধুনিক গান ও বাংলার সঙ্গীত এবং বাংলা সমাজ— দুয়েরই ওপর। আধুনিক বাঙালির ব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, মাপকাঠি, মনোভাব এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সঙ্গীত ও গানবাজনার ভূমিকা— সব ক্ষেত্রেই এই দ্বন্দ্বের প্রভাব। গুলিয়ে যাওয়া একটা আধাখেঁচড়া ব্যাপার আগাগোড়া এমনই প্রশ্রয় পেয়েছে যে আজ আধাখেঁচড়াও কিছু নেই, সবটাই নিপাট গুলিয়ে যাওয়া, অবয়বহীন, কিম্ভূতকিমাকার একটা বিষয় যার মাথামুণ্ডু নেই, আছে শুধু নিষ্প্রাণ, বিরক্তিকর, পুনরাবৃত্তিমূলক, মেধাহীন, শেকড়হীন, অর্থহীন, আনন্দহীন একটি বস্তুকে নিয়ে যে করে হোক-ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, মর্মান্তিকরকম হাস্যকর ও বিরক্তিকর চেষ্টা।

পাঁচের দশককে আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগ বলেন অনেকে। কেন যে বলেন কে জানে। শুধু কি এই কারণে যে ওই দশকে অনেক ভাল গায়ক-গায়িকার গান শোনা গিয়েছিল' কানে এসেছিল অনেক ভাল সুর? তাই যদি হয় তো কথার

দিকটার (গানের 'কথা'কে অনেকেই এখনও 'বাণী' বলে থাকেন) কী হবে? লিরিক রচনায় বাংলার 'গীতিকার' কূল কি সে সময়ে নতুন কিছু করে দেখাতে পেরেছিলেন? বিচার করলে দেখা যাবে তা না। সুর-তাল-ছন্দ-গায়কীর দিক দিয়ে পাঁচের দশকের আধুনিক গান যতটা মনগ্রাহী হতে পেরেছিল, কথার দিক দিয়ে তা সাধারণভাবে মোটেও পারেনি। কয়েকটি ব্যতিক্রমের নজির দেখিয়ে এই বক্তব্যকে খণ্ডন করা যাবে না। গান বস্তুটি যেহেতু ন্যূনতমভাবে কথা ও সুরের সমাহার তাই কথা দুর্বল হলে শুধু সুরের গুণে তা কি এতটাই বরণীয় হতে পারে যে আমরা একটি বিশেষ দশককে প্রশ্নাতীতভাবে 'স্বর্ণযুগ' বলতে পারি? সন্দেহ নেই, পাঁচ ও ছয়ের দশকে বাংলার সুরকাররা স্মরণীয় নিরীক্ষামনস্কতা ও উদ্ভাবনক্ষমতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন নানান আধুনিক গানে। অনেক গান বাস্তবিকই শুধু সুরের জন্যেই স্থায়ী জায়গা করে নিতে পেরেছে সুররসিক শ্রোতার মনে। কিন্তু যে 'আধুনিক' বাঙালি সেই যুগে আধুনিক বাংলা কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ পড়েছে, আধুনিক নাটক দেখেছে, বেঁচে থেকেছে এক পরিবর্তনশীল পরিবেশে, যেখানে অনেক সাবেক ভাবনা, ধারণা ও উচ্চারণ আর খাপ খায়নি বাস্তব অস্তিত্বের সঙ্গে, সেই মানুষ কি সেই সময়ের 'আধুনিক বাংলা গানের' মধ্যে সুর-কথা-গায়কী সব মিলিয়ে সত্যিই আধুনিকতা খুঁজে পেয়েছে? এমন একজনও কি ছিলেন না যিনি তা পাননি, যাঁর মনে আধুনিক বাংলা গানের কাঠামোগত দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্ন জেগেছিল? লিরিকের সাবেকিয়ানা, জাড্য, একমুখীতা কি সেই বাঙালি শ্রোতার কাছে একটা বেখাপ্পা দ্বন্দ্ব হিসেবে উপস্থিত হয়নি? এ নিয়ে আলোচনা চলতেই পারে, যদি সে আলোচনা আদৌ হয়। মুশকিল হল আধুনিক বাংলা গান নিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনাই হল না এখনও। কোনও কোনও 'গুরুস্থানীয়' মানুষ, বড় শিল্পী বা নামকরা পণ্ডিত একটা মত প্রকাশ করেন, অন্য সকলে গ্রহণ করেন আর আউড়ে যান সেটাই। প্রশ্নমনস্কতার স্থান এখানে নেই। অথচ রাস্তাঘাটে, অন্দরমহলে, অফিসকাছারিতে, স্কুলকলেজে মানুষ এই বিষয়ে কথা বলে। অর্থাৎ মানুষের বক্তব্য আছে, সে কিছু বলতে চায়। কিন্তু মনের কথাগুলি উপযুক্ত উল্লেখ ও যুক্তির মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করার দায় সাধারণ মানুষের নেই। সে দাবি তাঁদের কাছ থেকে করা যায় না। এই দাবি করা যায় সঙ্গীত, সংস্কৃতি, শিল্প, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে যাঁরা রীতিমতো ভাবনাচিন্তা ও লেখালিখি করেন তাঁদের কাছ থেকে। তাঁরা কিন্তু এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেননি। বেশিরভাগ কিছু আপ্তবাক্য ও দায়সারা কথা আউড়ে গেছেন ও যাচ্ছেন। সঙ্গীত-সাহিত্য আজও গড়ে ওঠেনি বাংলা ভাষায়। গড়ে ওঠেনি সঙ্গীত বিশ্লেষণের ভাষা ও সংস্কৃতি। এই বাস্তব পটভূমিতেই এ বইটি লেখা।

শারদীয় আজকালের জন্য লিখতে লিখতে এবং লেখাটি প্রকাশিত হবার পর আর একবার পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল কয়েকটি দিক আর একটু খোলসা করলে ভাল হয়। ভাল হয় আরও কয়েকটি ব্যাপার উল্লেখ করলে। বই আকারে

প্রকাশের জন্য লিখতে গিয়ে সেই কাজগুলি করতে চেষ্টা করেছি। আরও কিছু কথা বলার ছিল, কিন্তু সেগুলি বলতে গেলে এই বইটি সত্যিই ফের ঢেলে সাজাতে হবে। সেই ধৈর্য ও সময় আমার নিজেরই আছে কি?

দীর্ঘকাল গানবাজনা শুনেছি। আজও শুনছি। গানবাজনার প্রেমিক ও চর্চাকারী হিসেবেই নিজেকে দেখতে ভালবাসি। এই লেখায় এমন অনেক কিছু, এমন অনেক ব্যক্তির উল্লেখ আছে, খুব কম বাঙালিই যা এবং যাঁদের মনে রেখেছেন। অনেক গান ভুলে গিয়েছে বাংলার মানুষ। অনেক গানের রেকর্ডও আর পাওয়া যায় না। আগেকার অনেক শিল্পী ও স্রষ্টা মারা গেছেন। সঙ্গীতকার ও শিল্পীরা তাঁদের কাজ ও ভাবনা নিয়ে কিছু লিখে রেখে যাবেন— এই ঐতিহ্য ও অভ্যেসটাই উপমহাদেশে নেই। পাশ্চাত্যে এটি আছে। সেখানে তাই আজকের সঙ্গীত-লেখকদের অনেক সুবিধে হয়। কিন্তু আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে প্রধানত আমার স্মৃতির ওপরেই। এর ফলে কিছু এদিক-ওদিক হয়ে থাকতেই পারে। সে জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু সেই 'দুঃখ' বড় মাপের নয়। গানবাজনা, আধুনিক বাংলা গানের অনেক কিছু যে আমি মনে রেখেছি, অনেক গানও যে আমি আজও মনে রাখতে পেরেছি সে জন্য আমি গর্বিত। আমি গর্বিত, কারণ আমি জানি যে বাঙালি তার গানবাজনায় যে উদার মনোভাব দেখিয়েছে, দেশি-বিদেশি নানান উপাদান মিশিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার যে সাহস দেখিয়েছে, আধুনিক বাংলা গানের মধ্যে দিয়ে বাঙালি যে আবিশ্ব-আধুনিকতার নজির রাখতে পেরেছে তা পৃথিবীর আর কোনও জাতি বোধহয় পারেনি। এই একটি ক্ষেত্রে অন্তত বাঙালি জাতির উদারতা, সাহস, নিরীক্ষামনস্কতা ও সৃজনশীলতার কোনও তুলনা নেই। আধুনিক বাংলা গানের মাধ্যমে বাঙালি সঙ্গীতের এমন কিছু 'ইডিয়ম' সৃষ্টি করতে পেরেছে যা তার নিজস্ব। বাংলার অনেক মানুষ তা সচেতনভাবে ধরতে পারেননি হয়ত, কারণ এই ব্যাপারগুলি ধরতে হলে কিছু শর্ত পূরণ হওয়া দরকার। প্রথমত 'গান' শোনার সময় শুধু 'গান' নয় 'সঙ্গীত' শোনার ধাত থাকা দরকার। এই সঙ্গীত একটা সামগ্রিক ব্যাপার, যা শুধু গায়ক-গায়িকার গলা থেকে বেরয় না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটা আজও এমন যে ছেলেবেলা থেকে মানুষের কানে সুসম্বদ্ধভাবে সঙ্গীত পৌঁছে দেওয়া হয় না। পাশ্চাত্যে প্রতিটি কিন্ডারগার্টেন ও স্কুলে ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত গানবাজনার ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশে প্রাত্যহিক পাঠ শুরু হওয়ার আগে বড় জোর একটি প্রার্থনা গান হয়, যা আদৌ সুখশ্রাব্য নয়, যার মধ্যে কোনও আনন্দ বা মজা নেই। আছে গুরুগম্ভীর একটা ভার যা শিশুমন ও কিশোরমনে গানবাজনার প্রতি বিরক্তি জাগিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। সুখের বিষয়, ছোটরা ওই বস্তুটিকে আদৌ 'গান' ভাবেন না। গানবাজনা শোনেন তাঁরা স্কুলের বাইরে।

আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের গানবাজনা শিখতে পাঠানো হয় সঙ্গীত শিক্ষায়তনে বা শিক্ষকদের কাছে। তাঁরা কিছু পরীক্ষায় পাসও করেন। কিন্তু সঙ্গীত

বিদ্যালয় বা সঙ্গীত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মনে 'সঙ্গীত' সম্পর্কে সার্বিক কোনও ধারণা বা উৎসাহ জাগিয়ে তোলার কথা ভাবেন বলে মনে হয় না। অনুসন্ধিৎসা ও প্রশমনস্কতার কোনও স্থান সেখানে নেই।

অনেক কিছুই তাহলে 'নেই'। এত 'নেই'-এর মধ্যে কোনও শিল্পরূপ, আঙ্গিক তাহলে বেঁচে থাকবে কি শুধু বাজারকে অবলম্বন করে? বোধহয় তাই। আর সে ক্ষেত্রে তাহলে বাজারের অনুবর্তী হয়ে চলাই হবে মোটের ওপর এই শিল্পরূপের ধর্ম। বেচারা বাংলা আধুনিক গান আমাদের সমাজে সেই ধর্মই পালন করে চলেছে, আজও চলছে। এরও সমাজতত্ত্ব নিয়ে ভাল কাজ হতে পারে। অবশ্য সঙ্গীত বা সঙ্গীতের কোনও বিশেষ রূপের সমাজতত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে গেলে 'সঙ্গীত' বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক শিক্ষা ও ধারণাও থাকা চাই। কোনওদিন হয়ত সেই কাজ বাংলা ভাষায় হবে।

'কোন পথে গেল গান' আধুনিক বাংলা গানের ইতিহাস নয়। চার ও পাঁচের দশকের আধুনিক বাংলা গান নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও কিছু লেখালেখি হয়েছে। কোনও কোনও শিল্পীকে নিয়ে তো হয়েছেই। একাধিক শিল্পী গত কুড়ি বছরে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মিডিয়ায়। সেগুলি থেকেও শ্রোতারা পেয়েছেন কিছু মূল্যবান খবর, অন্তত ওই শিল্পীদের সম্পর্কে। কিন্তু সাতের দশক ও আটের দশকে ধুঁকতে থাকা বাংলা গানের ইন্ডাস্ট্রি যে নয়ের দশকের গোড়া থেকে অসংখ্য শ্রোতার টাটকা নতুন উৎসাহের ঝাপটায় দুলে উঠল, পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায় অর্থাৎ গানবাজনার বাজারেও যে এল অভূতপূর্ব এক জোয়ার (সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির দিক দিয়ে যা দস্তুরমতো গবেষণার দাবিদার, অথচ তা আজও হয়নি) সেই যুগমুহূর্ত পর্যন্ত আধুনিক বাংলা গান এল কীভাবে, কী ধরনের অবস্থার মধ্য দিয়ে কোন পথে তা নিয়ে লেখা এখন পর্যন্ত খুব কমই হয়েছে। যেটুকু হয়েছে তাতে অনেক জরুরি বিষয় ও ভাবনা স্থান পায়নি। তার কারণ, এ ধরনের লেখা দাঁড় করাতে গেলে পাঁচ দশকের আধুনিক বাংলা গান ও বাজনা শোনার অভিজ্ঞতা যেমন থাকতে হবে, অসংখ্য গান যেমন মনে থাকতে হবে, তেমনি থাকতে হবে সঙ্গীত জগতের অনেক ব্যক্তিত্ব ও ব্যাপার এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সময়, সমাজ, সমকালীন ইতিহাস ইত্যাদির প্রেক্ষিতে সঙ্গীত, আধুনিক বাংলা গান নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে ও যোগ্যতা। এ কথাটি প্রথমেই স্পষ্ট ভাষায় বলা দরকার। শুধু স্মৃতি রোমন্থন, প্রিয় কিছু শিল্পীর স্মৃতিচারণ ও প্রশংসা আদৌ যথেষ্ট নয়। আধুনিক বাংলা গান বিষয়টি সার্বিকভাবে, সময়, সমাজ, মুহূর্ত এবং অন্যান্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে তার প্রতিই সুবিচার করা যাবে না। তেমনি আধুনিক বাংলা গানের শরীরে এবং তার জগতে কোন কোন দ্বন্দ্ব ছিল তা নিয়েও নির্মোহ হয়ে ভাবা দরকার, সেগুলি শনাক্ত করা একান্তই প্রয়োজন। দীর্ঘকাল সৃষ্টি ও চর্চার ধারাবাহিকতার পর বর্তমানে যে বাংলা গান রচনা করা হচ্ছে তার ঘাটতি, দুর্বলতা ও দ্বন্দ্ব কোথায় কোথায়, পরিবেশটাই বা কেমন, গান তৈরি,

প্রযোজনা, উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রটি কীভাবে পাল্টে গিয়েছে, কোন কোন নতুন ব্যাপার এসে উপস্থিত হয়েছে, পালটে যাওয়া যুগে 'আধুনিক বাংলা গান' বস্তুটিকে সমকালীন স্রষ্টা ও শিল্পীরা কোন চোখে, কীরকম মন দিয়ে দেখছেন, তাঁদের ক্ষমতা ও অক্ষমতাই বা কোথায়, পরিবর্তনগুলি কোথায় কোথায় হয়েছে— এই এতগুলি দিক কিছুটা হলেও বিবেচনা না করলে যুক্তিগ্রাহ্য কোনও সিরিয়াস আলোচনা হওয়া সম্ভব নয়। আমি যে সবকটি দিকের প্রতি সুবিচার করতে পেরেছি সে দাবি আমার নেই। কিন্তু অল্প সময়ে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। ইংরেজি 'essay' কথাটি এসেছে ফরাসি ভাষার ক্রিয়াপদ 'essayer' থেকে, যার অর্থ 'চেষ্টা করা'। আমার এই লেখাটি আক্ষরিক অর্থেই একটি 'essay'। চেষ্টা। তার বেশি কিছু নয়। এর মধ্যে দিয়ে আমি আমার পর্যবেক্ষণ, ধারণা ও সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিতে চেয়েছি উৎসাহী মানুষের কাছে। আবার বলছি, টানা লিখেছি, গবেষণাগ্রন্থ লিখতে চাইনি, অনেক সময়ে কথা বলে যাওয়ার ভঙ্গিতেই লিখে গিয়েছি, তাই দু-এক জায়গায় পুনরাবৃত্তি এসে গিয়েছে। একটা কথা বলতে গিয়ে তার সূত্রে অন্য কথাও (অবান্তর নয়) এসে গিয়েছে বিষয়টিকে আরও খুলে দেওয়ার জন্য। বাংলা গানের প্রসঙ্গ থেকে পাশ্চাত্যের গান, কোন পরিবেশে, কোন সময়ে গানের একটি বিশেষ ধরন বা বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল সেই কথাও এসে পড়েছে। যাঁরা যথেষ্ট সময় নিয়ে আলোচনাগ্রন্থ লেখার আঙ্গিকে বই লেখেন তাঁরা এই ধরনের বিস্তারের স্বার্থে সম্ভবত আলাদা পরিচ্ছেদ বানিয়ে দিতেন। আমি তা দিইনি। অত গুছিয়ে লেখার লক্ষ্য আমার ছিল না। এ জন্য আমি দুঃখিত নই। আমার স্মৃতিতে অনেক কথা ছিল, আজও আছে, আমার ভাবনায় আছে আরও অনেক কথা। তার কিছুটা বেরিয়ে এসেছে এই বইতে। আমি যদি কাউকে এই কথাগুলি সামনে বসে বলতাম, তাহলে যেমন হত, আমার এই বইটি তেমনই। তার বেশি কিছু নয়।

পশ্চিমবঙ্গে খুব কম মানুষই বাংলাদেশের সঙ্গীত জগৎ সম্পর্কে কিছু জানেন। আধুনিক বাংলা গান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কোনও শিল্পী বা লেখক যখন কিছু বলেন বা লেখেন তখন মনে হয় বাংলা আধুনিক গান যেন বাংলার শুধু এই রাজ্যেই হয়েছে, হয়ে থাকে। আমি চেষ্টা করেছি অল্প কিছু জায়গায় ও সীমিত মাত্রায় হলেও বাংলাদেশের কথা বলতে, যদিও আমার জ্ঞানও খুবই কম। এ ব্যাপারে শ্রীমতী সাবিনা ইয়াসমীনের কাছে আমি ঋণী। অনেক তথ্য তিনিই আমায় দিয়েছেন।

সবশেষে আমার ঋণ স্বীকার করতে চাই শ্রী অলক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে, তিনি আমায় নানাভাবে উৎসাহ ও তাড়া দিয়েছেন এই লেখাটি লিখতে। দীর্ঘকাল তিনি ভালবেসে আধুনিক বাংলা গান শুনে এসেছেন। ভালবেসে স্মরণ করছি আমি শ্রীশচীদুলাল দাসকেও। যাঁর মতো সুররসিক ও গানপ্রেমী মানুষ কমই দেখেছি এ জীবনে। আজও তিনি হঠাৎ টেলিফোন করে বলেন, সুমন, এই গানটা

একবার শোনো তো। এই বলে তিনি ক্যাসেট প্লেয়ার বা সি ডি প্লেয়ারে একটি পুরনো, ভুলে যাওয়া গানের রেকর্ড বাজান। কত সময়ে আমরা দুজন মিলে টেলিফোনেই একটি গানের স্থায়ী, অন্তরা বা সঞ্চারী গেয়েছি, অমন সুর আর হবে না বলে হাহুতাশ করেছি। এই বইটি আমি তাঁদের দুজনকেই উৎসর্গ করলাম।

আজকাল পত্রিকা ও প্রকাশনার কাছেও আমি ঋণী আমার অদ্ভুত সব লেখা তাঁরা কষ্ট করে প্রকাশ করেন বলে।

৩১ ডিসেম্বর ২০০৫

কলকাতা

'Futures not achieved are only branches of the past: dead branches.'- *Italo Calvino* (Invisible Cities)

এই তো সেদিন এক শনিবার দুপুরে গড়িয়াহাটায় দেখলাম তিন কিশোর গল্প করতে করতে হেঁটে যাচ্ছেন। প্রত্যেকের হাতেই গিটার। দুজনের গিটার খাপবন্দী। একজন তাঁর খাপখোলা গিটারটি কাঁধে নিয়ে হাঁটছেন। দৃশ্যটি আমায় মুহূর্তে ফিরিয়ে নিয়ে গেল আমার ছেলেবেলায়। ১৯৫৭ বা '৫৮ সাল। দক্ষিণ কলকাতার এস আর দাশ রোডের এক প্রতিবেশীর বড় মেয়েকে দেখতাম খাপে-ঢাকা একটি গিটার নিয়ে বাজনার স্কুলে যেত। বয়সে আমার চেয়ে অনেকটাই বড়। রঙিন শাড়ি আর হিল তোলা জুতো পরে গিটার হাতে সটান হেঁটে যেতেন। আমরা, রাস্তায় খেলতে থাকা পাড়ার ছোটদের দল, সরে গিয়ে তাঁকে পথ করে দিতাম। মাঝেমাঝে সেই দিদিদের বাড়ি থেকে গিটারের সুর ভেসে আসত। পরিচিত কোনও বাংলা আধুনিক গানের সুর। সে-গিটার আর বর্তমানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা গিটার কিন্তু এক জিনিস নয়। তখন ছিল হাওয়াইয়ান গিটারের যুগ। কোলে শুইয়ে, একাধিক আঙুলে প্লেকট্রাম পরে, ইস্পাতের একটি চকচকে বার দিয়ে বাজাতে হত সেই গিটার। আমাদের দেশে আর বাংলাদেশে আজ লোকে গিটার বলতে বোঝে বাংলায় আমরা যাকে 'স্প্যানিশ গিটার' বলে থাকি। গিটার যন্ত্রটি পৃথিবীর যে গোলার্ধে সবচেয়ে চালু, সেখানে কিন্তু আমাদের 'স্প্যানিশ'কে নিছক গিটারই বলা হয়। স্পেনে যে গিটার জনপ্রিয় এবং একাধিক লোকনৃত্যের অনুষঙ্গ হিসেবে চালু, তার আকার একটু অন্যরকম, বেশ কিছুকাল হল তার তারগুলি নাইলনের, তা ছাড়া সেটি আঙুলের নখ দিয়ে বাজাতে হয়। এটি 'ক্লাসিকাল গিটার' নামেই বেশি পরিচিত। যাই হোক, আজকের ওই তিন কিশোর আধুনিক বাংলা গান বা দুর্দান্ত হিট কোনও হিন্দি ছবির গানের সুর তাঁদের গিটারে তুলবেন বলে মনে হয় না। তাঁরা শিখবেন গিটারে নানান অবস্থান থেকে সপ্তকের স্বরগুলি আর বিভিন্ন কর্ড বিবিধ ছন্দে বাজাতে, যদিও তাতে আট মাত্রা আর ছ'মাত্রাই

সম্ভবত হবে একমাত্র অবলম্বন। উপমহাদেশসমেত পৃথিবীর আরও কোনও কোনও দেশে পাঁচ মাত্রা (jazz-এ বিলক্ষণ আছে), সাত মাত্রা, দশ মাত্রার যে তালগুলি অনেককাল ধরে বর্তমান, আমাদের দেশের আজকের গিটার শিক্ষার্থীরা তার পরিচয় সহজে পাবেন না কারণ আজকের জনপ্রিয় গানগুলি ওই তালগুলি এড়িয়ে চলে।

আমার ছেলেবেলার সেই পাড়াতুতো দিদির আমলে কিন্তু হাওয়াইয়ান গিটার শিক্ষার্থীদের ওই সব তাল এড়িয়ে যাওয়ার জো ছিল না। সে যুগে কাহারবা আর দাদরা তাল বাদ দিলেও গান, গানের সুর জনপ্রিয় হতে পারত। ধরা যাক, পাঁচের দশকে বেতারে বারবার শোনা 'মেঘ কালো আঁধার কালো, আর কলঙ্ক যে কালো'। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া, নচিকেতা ঘোষের সুর, গীতিকার ছিলেন প্রিয়ব্রত। গানটি ছিল সাত মাত্রায়। তেমনি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর 'পাল্কির গান'-এ সুর দিতে গিয়ে সলিল চৌধুরি একাধিক তালফেরতা ব্যবহার করেছিলেন। ছ'মাত্রার দাদরা (সেকালে 'ডবল দাদরা' বলা হত), আট মাত্রার কাহারবা, সাত মাত্রার তেওড়া— সবই ছিল। বস্তুত, গানটি 'ডবল দাদরা'য় শুরু হয়ে এবং গানের বেশিরভাগটায় সেই তাল আর দুলুনি বজায় রেখে শেষ হচ্ছে কিন্তু একটু ঢিমে সাত মাত্রায়।

সাত মাত্রার প্রয়োগ আমরা পাঁচ ও ছয়ের দশকে আরও কিছু স্মরণযোগ্য বাংলা আধুনিক গান পেয়েছি। যেমন, সলিল চৌধুরির লেখা, নচিকেতা ঘোষের সুর করা, সবিতা চৌধুরির গাওয়া 'আঁধারে লেখে গান হাজার জোনাকি'। সলিল চৌধুরির লেখায়-সুরে 'নৌকা বাওয়ার গান' ('ও মাঝি ভাইও') সাত মাত্রায় অনবদ্য। তাঁরই আর একটি গান 'সেই মেয়ে'-তেও (সুচিত্রা মিত্রর গাওয়া) তালফেরতায় সাত মাত্রা।

আমার সেই পাড়াতুতো দিদি ও তাঁর সহশিক্ষার্থীরা গানবাজনার যে পরিবেশে ছিলেন তাতে সঙ্গীতের নানান বৈচিত্র্য ও উপাদানের স্থান ছিল। রেডিও চালালে যে গানবাজনা শোনা যেত তা যে শুধু বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল তা নয়, ছিল ছাঁকনিতে ছেঁকে নেওয়াও। বেতারে বা গ্রামোফোনে যত গানবাজনা হত, তার সবটা উৎকৃষ্ট ছিল না মোটেও। মামুলি জিনিসও ছিল প্রচুর। কিন্তু গানবাজনার ছিটেফোঁটাও শেখেননি, গলা বা হাত বেসুর, কোনও দিক দিয়েই আড় ভাঙেনি এমন মানুষের গান বা বাজনা প্রকাশ্যে শোনা যেত না। এমনকি পাড়ার জলসাতেও যে সব স্থানীয় 'উদীয়মান' শিল্পীর গানবাজনা শোনা যেত, তাও নেহাত ফ্যালনা ছিল না। নয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে এখন পর্যন্ত, বিশেষ করে গত বছর পাঁচেকে পশ্চিমবঙ্গে আমরা যে 'সঙ্গীতশিল্পীদের' (?) গানবাজনা শুনছি, সমাজে, টেলিভিশনে যাঁদের অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান দেখছি-শুনছি, কোনও কোনও পত্রিকায় যাঁদের ছবি দেখছি, তাঁদের অনেকেরই মান সে-যুগের পাড়ার জলসার 'উদীয়মান শিল্পীদের' চেয়েও অনেক নিচু। সে-যুগের সেই শিল্পীদের মধ্যে বেশিরভাগই কোনওদিন নাম করতে পারেননি। আজকের এই গাইয়ে-বাজিয়েরা কিন্তু দস্তুরমতো

নাম করে গিয়েছেন, গানবাজনা (?) করে ভাল রোজগার করছেন, এঁদের বেশিরভাগ কস্মিনকালে সঙ্গীতশিক্ষা না করেও ইদানীং এমনকি গানের প্রতিযোগিতায় বিচারকের ভূমিকাতেও থাকছেন, ভাষণ দিচ্ছেন সঙ্গীত সম্পর্কে।

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ আর অভ্যেস ছাড়া কেউ সচরাচর মিস্ত্রি, ঘরামি, কামার, কুমোর, তাঁতি, ছুতোর, নাপিত, হালুইকর, ময়রা, দর্জি, কসাই, মালি, চাষী, জেলে, মাঝি, গেছো— কিছুই হতে পারে না। নিজের নিজের ক্ষেত্রে কোনওদিন কিছুই শেখেনি, কোনও অভিজ্ঞতাই নেই এমন মানুষদের নিয়ে কোনও সমাজ না পারে গড়ে উঠতে, না পারে চলতে। যদি এমন দিন আসে যে খান-দুই বাক্য আগে উল্লেখিত মানুষরা, পেশাজীবীরা আসলে কেউ কোনও কাজ শেখেননি, জানেন না, অথচ প্রত্যেকেই নিজেকে অমুক তমুক বলছেন এবং নানান পেশায় কাজ করতে চাইছেন, তো বুঝতে হবে সার্বিক অরাজকতা ও ধ্বংস আসন্ন।

আমাদের সমাজে বেতার ও গ্রামোফোন আসার পর থেকে সঙ্গীত জগতে যে আলোড়ন দেখা দেয়, তা যদি শিক্ষানিরপেক্ষ ও সাঙ্গীতিকভবে নির্গুণ ও বাক্‌সর্বস্ব হত, তাহলে বেতার বা গ্রামোফোন কোনওটাই চলত না। কারবার উঠে যেত। ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়ে লোকে কামার বা রাজমিস্ত্রি হয়েছে, তেমনি সে যুগে (স্বাভাবিকভাবেই) ওস্তাদ বা কোনও শিক্ষকের কাছে তালিম নিয়ে গায়ক-বাদক হয়েছে। উপমহাদেশে কারুর কাছে তালিম ছাড়া, শুধু কানে শুনে যুগন্ধর কণ্ঠশিল্পী হতে পেরেছেন, গুণীদের তারিফ পেয়েছেন সম্ভবত একমাত্র মৈজুদ্দিন। তিনি ছিলেন স্বভাব গায়ক এবং অবিশ্বাস্যরকম শ্রুতিধর। কিন্তু সচরাচর, ধ্রুপদী সঙ্গীতে দস্তুরমতো প্রশিক্ষণ নিয়ে তবেই মানুষ শিল্পী হিসেবে আসরে প্রবেশাধিকার পেয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। লঘু সঙ্গীতও ব্যতিক্রম নয়। সঙ্গীতশিক্ষা, রেওয়াজ, পরিশ্রম ছাড়া, শুধু খবরকাগজ, বন্ধুভাবাপন্ন সাংবাদিক, টেলিভিশন চ্যানেল, মদতদাতা চ্যানেলকর্তা বা কর্মীর জোরে গানবাজনায় নাম করে যাওয়ার রীতি যদি বরাবর দুনিয়ায় থাকত, সারা পৃথিবীতে সঙ্গীতের যে কী হাল হত, তা কল্পনা করে নিতে অসুবিধে হবে না যদি কেউ আজকের পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের দিকে তাকান।

ব্রিটিশ আমল থেকে উপমহাদেশের বেতারে গানবাজনা করতে গেলে পরীক্ষা দিতে হত। সেই 'অডিশনে' শুধু একটি তানপুরা আর তবলার সঙ্গতে গাইতে ও বাজাতে হত। পরীক্ষকরা বসে থাকতেন আলাদা ঘরে। পরীক্ষার্থীর গান তাঁরা স্পিকারে শুনতেন। পাঁচের দশকের মাঝামাঝির ঠিক পর থেকে আকাশবাণীর সঙ্গে আমার পরিচয়। ১৯৬৬ সালে (আমার বয়স তখন ১৭) আমি যখন 'জেনারেল প্রোগ্রাম' বা 'বড়দের অনুষ্ঠানের' জন্য প্রথম বেতারে অডিশন দিই, পরীক্ষকদের কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাঁরা স্টুডিওর স্পিকারে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, আমি তা পালন করছিলাম। অডিশনে পাস করলে তবেই মানুষ বেতারে গান করার যোগ্যতা অর্জন করত। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের, অডিশনে কে

কেমন গাইলেন তার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে ফেলা হত। পাঁচের দশকে 'এ', 'বি' আর 'সি'— এই তিনটি শ্রেণী ছিল। ছয়ের দশক থেকে 'সি' গ্রেডটি তুলে দেওয়া হল, সম্ভবত বলতে বা শুনতে খারাপ লাগে বলে। তখন দাঁড়াল, এ, বি-হাই আর বি। এই শ্রেণীর হিসেবে বেতারে অনুষ্ঠানের ডাক পেত লোকে। এ আর বি-হাই শিল্পীরা ডাক পেতেন বেশি, ঘনঘন, বি শিল্পীরা তার চেয়ে কম। বেতার অনুষ্ঠানে খারাপ গাইলে নামী গায়কদেরও আকাশবাণী থেকে জানানো হত। পর পর অনুষ্ঠান খারাপ হলে শিল্পীদের দেওয়া হত সতর্কতা বিজ্ঞপ্তি। বি গ্রেড থেকে সি গ্রেডে নামিয়ে দেওয়ার ঘটনা বারবার না ঘটলেও, একাধিকবার ঘটেছে আকাশবাণীতে পাঁচের দশকে। তেমনি, প্রথম অডিশনে তলার গ্রেড পেলে শিল্পীর অধিকার ছিল কিছুদিন পরে রি-অডিশন দেওয়ার। বাংলার একাধিক নামী শিল্পী চারের দশকে ও পাঁচের দশকের গোড়ায় প্রথম অডিশনে একেবারে তলার শ্রেণী পেয়েছিলেন (তাও বারবার পরীক্ষা দিয়ে)। কিছুকাল পরে তাঁরা আবার পরীক্ষা দিয়ে ওপরের শ্রেণীতে ওঠেন। একাধিকবার অডিশনে অকৃতকার্য হয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের একজন ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। এমনকি তিনি! এ জন্য, কী আশ্চর্য, তাঁর মনে গর্বও ছিল। একবারও তাঁকে বলতে শুনিনি, আমার মতো আর্টিস্টকে ফেল করিয়ে দিল! বরং, খুব ছোটবেলায় তাঁকে বলতে শুনেছি, 'তোমার বাবা যখন অডিশন বোর্ডে ছিলেন, আমি তখন কয়েকবার ফেল করেছি, পরে তাঁর হাতেই করেছি পাস। কী কড়া আর নির্ভেজাল মানুষই না ছিলেন বড়দা। কোথাও একটু ত্রুটি হলে কোনও ক্ষমা নেই। আবার সত্যিই নিখুঁত গাইলে বুকে টেনে নেওয়া!'

বেতারের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে যাঁরা বেরিয়ে আসতেন, তাঁদেরই গানবাজনা শুনত উপমহাদেশের মানুষ, শুধু উপমহাদেশ কেন, সারা পৃথিবীর মানুষ। তেমনি, বেতার অনুমোদিত সুরকার ও গীতিকাররাও ছিলেন। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বেতারে গানের কথার ব্যাপারে বাধানিষেধ আছে, থাকতে বাধ্য। সব কথা বেতারে বলা যায় না। তেমনি, সব বিষয়ে গানও লেখা যায় না যদি সে-গান বেতারে প্রচারিত হতে হয়। কিন্তু বিষয়ের সীমা সত্ত্বেও কোন গানের লিরিক আদৌ লিরিক হয়ে উঠেছে তা বোঝার মতো মানুষ আকাশবাণীতে বিলক্ষণ ছিলেন। এ নিয়ে তর্কের অবকাশ থাকতেই পারে। কেউ বলতেই পারেন, আকাশবাণী থেকে প্রচারিত অধিকাংশ গানের কথা ছিল একই বিষয়নির্ভর, একঘেয়ে শব্দ ও রূপকল্পে ভরা, একাধিক দিক দিয়ে পৌনঃপুনিকতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু সে ব্যাপারে আকাশবাণীর তেমন কিছু করার ছিল না। কোনও গীতিকার যদি উদ্ভাবনপটু ও সৃজনশীল না হন তো আকাশবাণীর বা রাষ্ট্রকে সে জন্য দায়ী করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ ওরই মধ্যে এক সময়ে আমরা জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'এ কেমন রাত পোহাল দিন যদি আর এলো না', 'পদ্মপাতায় রেখেছ আমার মনের সুধা', 'এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার', 'আমি ফুলকে যেদিন কেঁদেসেধে আমার সাজি ভরেছি'র

মতো লিরিক পেয়েছি সাতের দশকের প্রথমার্ধে। গানগুলি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের আধুনিক গানের অনুষ্ঠানে প্রচারিত হত। এই সুযোগে বলে রাখি, আমার 'হাল ছেড় না বন্ধু', 'আমায় যদি দেখতে চাও', 'কতটা পথ পেরলে তবে পথিক বলা যায়' ইত্যাদি গান গ্রামোফোন রেকর্ড করার প্রায় এক বছর আগে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের আধুনিক গানের নিয়মিত অনুষ্ঠানে আমিই গেয়েছিলাম, শুধু গিটার বাজিয়েই, কারণ গীতিকার হিসেবে অনুমোদন আমি পেয়ে গিয়েছিলাম তার মধ্যেই। রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের আওতায় থেকেও গ্রহণযোগ্য লিরিক দেখা যায়, যদি ক্ষমতা থাকে। আকাশবাণীর অনুমোদনের জন্য আর সকলের মতো আমাকেও বিভিন্ন বিষয়ে পঁচিশটি গান জমা দিতে হয়েছিল। তার মধ্যে ঋতু, প্রেম, দেশপ্রেম, ভক্তি ইত্যাদি বিষয়ও ছিল।

তিন, চার ও পাঁচের দশকে সুরকার হিসেবে যাঁরা বাঙালি সমাজে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন, তাঁরাও নিঃসন্দেহে বড় মাপের শিক্ষা, প্রতিভা ও সৃজনশীলতার অধিকারী ছিলেন। আমি লজ্জিত যে বাংলাদেশের আধুনিক সঙ্গীত জগৎ সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই সীমিত। কিন্তু তাও পাঁচ ও ছয়ের দশকে বাংলাদেশের (তখনও পূর্ব পাকিস্তান) আবদুল আহাদ, আবদুল লতিফ, ধীর আলি মিয়াঁ, কাদের জমিরি, আবদুল হালিম চৌধুরি, সমর দাস, আলতাফ মাহমুদ, খান আতাউর রহমান, সুবল দাস, সত্য সাহা, আনোয়ার পারভেজ, আলি হোসেন, করিম শাহাবুদ্দিন, আজাদ রহমান, রবিন ঘোষের মতো সুরকাররা (অনেকের নাম আমার ঠিক জানা নেই) যে কাজ করে গিয়েছেন, তার পরতে পরতে তাঁদের শিক্ষা, বিবর্তন, প্রতিভা ও সৃজনশীলতার পরিচয়। পশ্চিমবঙ্গের সুরকারদের পাশাপাশি এঁদের এবং এঁদের পরবর্তী প্রজন্মের সুরকার, যেমন আলম খান, আলাউদ্দিন আলি, দেবু ভট্টাচার্য, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের সুরগুলি না শুনলে এ রাজ্যের বাঙালির অভিজ্ঞতা চিরকাল একপেশে আর আধাখেঁচড়াই থেকে যাবে। এতদিন ধরে এ রাজ্যে সেই ট্র্যাডিশনটাই চালু। মোট কথা, গায়ক-গায়িকাদের মতো, যন্ত্রীদের মতো, সুরকাররাও ছিলেন যোগ্যতার অধিকারী। আচমকা একদিন 'পি আর' অর্থাৎ 'পাবলিক রিলেশনস'-এর জোরে প্রচারমাধ্যমের ঢাক পিটিয়ে, কাগজে ছবিটবি ছাপিয়ে, টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিয়ে কেউ ঘোষণা করে ফেললেন যে তিনি সঙ্গীতকার, এমন কালচার তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, এমনকি আটের দশকেও বাঙালির ছিল না। থাকলে আমরা পঙ্কজ মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, কাজী নজরুল ইসলাম, কমল দাশগুপ্ত, দুর্গা সেন, অনুপম ঘটক, রবিন চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মন, সুধীরলাল চক্রবর্তী, সঙ্গীতাচার্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, কালীপদ সেন, পরেশ ধর, অনিল বাগচি, সলিল চৌধুরি, নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ভি বালসারা, অলোকনাথ দে কাউকেই পেতাম না। পেতাম না সুরকার হিসেবে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকাকে।

কৃতী মানুষদের নামের তালিকা দেওয়া আমার এই লেখার উদ্দেশ্য নয়, তাই কিছু নাম বাদ পড়ছে। মোট কথা, জীবন ও জীবিকার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো রাগসঙ্গীত ও লঘুসঙ্গীতেও তালিম, ধারাবাহিক অনুশীলন ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার পথ ধরেই মানুষের 'শিল্পী' হয়ে ওঠার কথা। দীর্ঘকাল সেই রেওয়াজই ছিল এ দেশে। বেতারের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করলে তবেই লোকে গ্রামোফোন রেকর্ড করার ভাবতে পারত। সেখানেও পরীক্ষা ছিল। বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গীতবিশারদরা আবেদনকারীর গান শুনতেন— কী এ দেশে, কী বিদেশে। আকাশবাণীর সঙ্গে রেকর্ড কোম্পানিগুলির চুক্তি ছিল। গ্রামোফোন ডিস্ক বেরলে আকাশবাণীর হাতে তা আসত। বেতারের নানান অনুষ্ঠানে তা বাজত। অর্থাৎ শ্রোতারা বেতারে যে গ্রামোফোন রেকর্ডগুলি শুনতেন, সেগুলিও ছিল যোগ্য শিল্পীদের গাওয়া, সুর করা, লেখা। তার মানে এই নয় যে প্রতিটি গান খুব উচ্চমানের ছিল, ছিল খুব স্মরণীয়। তা হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু ন্যূনতম একটা মান যে অন্তত বেশিরভাগ গ্রামোফোন রেকর্ডেরই ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

২

আধুনিক বাংলা গান গত পরশুর খোকা নয়। উনিশ শতক থেকে এ নিয়ে ভাঙাগড়া, পরীক্ষানিরীক্ষা, অনুশীলন ও চর্চা হতে থাকে। এ-দেশে বেতার ও গ্রামোফোন আসার ফলে সঙ্গীত হয়ে ওঠে সামাজিকভাবে গতিশীল। রেকর্ডের ব্যবসার জন্য গানের চাহিদাও বাড়তে থাকে। দুয়ের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ম্যানুয়াল রেকর্ডিংয়ের জায়গায় চালু হয়ে যায় বৈদ্যুতিক রেকর্ডিং প্রযুক্তি আমাদের এই শহরে। গ্রামোফোনের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক উন্নতি মোটামুটি অল্পকালের মধ্যেই অনেকটা এগিয়ে যাওয়ায় রেকর্ডিংয়ের মান এবং গ্রামোফোন কোম্পানির উৎপাদন ক্ষমতা দুই-ই যায় বেড়ে। ফলে আরও গান, গানের গীতিকার, সুরকার, গায়ক-গায়িকা আর যন্ত্রশিল্পীর প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলায় এসে পড়ে পেশাদার সঙ্গীতশিল্পীদের যুগ। কাজী নজরুল ইসলাম, যেমন, আমাদের দেশের প্রথম প্রজন্মের পেশাদার সঙ্গীতকারদের অন্যতম ছিলেন। সঙ্গীতসৃষ্টি ও সঙ্গীত পরিবেশনার সুযোগ ও পরিসর অল্প সময়ের মধ্যে অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় সৃষ্টির একটা হুল্লোড় পড়ে যায় বাংলায়। যে প্রশ্নটি এখানে স্বাভাবিকভাবে ওঠার কথা— একসঙ্গে অতজন সৃজনশীল মানুষ গানের জগতে জুটলেন কী করে। সুযোগ বাড়লেই যে সৃজনশীলতা বাড়বে, বৃদ্ধি পাবে গুণী মানুষের সংখ্যা, তা বোধহয় বলা যায় না। এই মুহূর্তে ক্যাসেট ও সিডিতে, নানান টিভি চ্যানেলে, এফ এম বেতার চ্যানেলে, এমনকি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উৎসবে-জলসায় বাংলা গান গেয়ে-বাজিয়ে প্রচারের সুযোগ এতটাই বেশি যে, মাত্র দু'দশক আগে তা কল্পনাও করা যেত না। কিন্তু গানের মতো গান সেখানে কটা শোনা যাচ্ছে? ক'জনের গানবাজনা শুনলে ইচ্ছে হয় আরও শুনতে? ফি মরশুমে, ফি বছর হাজার হাজার নতুন গান। বিলিতি ইঁদুর আর গিনিপিগও হকচকিয়ে যাবে সমকালীন বাঙালির গান-প্রসবের বহর দেখে। কিন্তু কটি গান গুনগুন করতে ইচ্ছে করছে কারুর? তাহলে, গাজবাজনা প্রচারের সুযোগ বাড়লেই যে ভাল গানবাজনার বহর আর যোগ্য, সৃজনশীল সঙ্গীতকার, সঙ্গীতশিল্পীর সংখ্যাও বাড়বে, তা সত্য না-ও হতে পারে। কিন্তু এটা সত্যি যে, বিশ শতকের তিন থেকে পাঁচের দশকের মধ্যে পেশাদার বাংলা গানের জগতে অনেক গুণী মানুষের এক বিস্ময়কর সমাগম হয়েছিল। পাওয়া গিয়েছিল মনে দাগ কাটার মতো, মনে রাখার মতো অনেক গান। কেন এটা ঘটেছিল শুধু সেটাই হয়ত একটা আলাদা

গবেষণার বিষয় হতে পারে। এই লেখার পরিসরে শুধু এটুকুই জল্পনার ভঙ্গিতে বলা যায় যে, দীর্ঘকাল ধরে চর্চা হতে হতে বাংলা গান নতুন নতুন রূপে প্রকাশিত হওয়ার অভূতপূর্ব একটা সুযোগ বেতার-গ্রামোফোন-জলসা এই তিনটি নতুন ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে এসে পড়ায় বাঙালি সঙ্গীতকার, শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের মনে একটা জোরালো স্ফূর্তি সম্ভবত দেখা দিয়েছিল। ওই সুযোগটি ছিল একেবারেই অভিনব, তাই ওই স্ফূর্তি। কিন্তু শুধু স্ফূর্তি, উদ্দীপনা, এসো-কিছু-একটা-করে-ফেলি-গোছের বেপরোয়া ভাব দিয়ে সৃষ্টি হয় না, কাজের ধারাবাহিকতাও বজায় রাখা যায় না। শিক্ষা। তালিম। অনুশীলন। অধ্যবসায়। ভাল কাজ শোনা। এই দিকগুলি যদি সে-যুগে বাংলায় জোরালো না হত তো ওই গুণী সমাবেশ ঘটত না, মিলত না ভাল গানের ওই সম্ভার।

গানবাজনা লোকে শোনে প্রধানত সুর-তাল-ছন্দের আকর্ষণে। গানের কথা নিয়ে মানুষ সচরাচর তেমন চিন্তিত হয়ে ওঠে না। তেমনি, যে মন নিয়ে মানুষ কবিতা পড়ে বা শোনে, সেই মন নিয়ে মানুষ গান শোনে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি নিবন্ধে মোক্ষম লিখেছেন: 'কবিতার কথা পড়িবার জন্য আর গানের কথা শুনিবার জন্য।' তাঁর মতো কাব্যপ্রাণ, কাব্যনিষ্ঠ মানুষও ওই দুই কথাকে 'এক তুলাদণ্ডে ওজন করিবার' ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন তাঁর পাঠক-শ্রোতাদের। সেই সঙ্গে তিনি অবশ্য জানাতে ছাড়েননি যে, তাঁর মন থেকে যখন গান এল তখন তা 'কথা আর সুরের গলাগলির' পরিণামই হল। এই কথা-সুরের গলাগলির দিকটা খেয়াল রাখাটা জরুরি। আধুনিক বাংলা গানের প্রধান আবেদন ছিল সুরে-তালে। সুর এমনই এক শক্তি যার ম্যাজিকে অতি অকিঞ্চিৎকর কথাও পার পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার একটা সীমা থাকে। সীমাটা বোধহয় সময়ই ঠিক করে দেয়। অথবা, এভাবেও বলা যেতে পারে যে, সময় ও যুগমুহূর্ত ওই সীমা সম্পর্কে কোনও কোনও মানুষকে সচেতন করে তোলে। বেঁচে থাকার চেষ্টায়, জীবনধারণের প্রয়োজনে সাধারণ-অসাধারণ মানুষের এত সময় আর মেহনত যায় যে সঙ্গীত, গান, কবিতার মতো বিষয়ে সচেতন থাকার অবকাশ তার হয় না। তা ছাড়া, সঙ্গীত বা ওই ধরনের শিল্পের ব্যাপারে সবাই সমান মাত্রায় সংবেদনশীল নন। পৃথিবীতে এমন মানুষ নেহাত কম নন, সুর যাঁদের কিছুই বলে না। তবু সকলেই সঙ্গীত শোনেন। সেই 'শোনা' সবার ক্ষেত্রে একরকম নয়, সবার ভেতরে সুর-তাল-ছন্দ সমমাত্রিক প্রতিক্রিয়া ঘটায় না, এক ধরনের অনুরণন তোলে না। তবু শোনেন সকলেই। এখানেই সঙ্গীতের সঙ্গে মানুষের এক আশ্চর্য সম্পর্কের সূত্র রয়েছে।

অন্য সব জাতির মতো বাঙালিও বেতার ও গ্রামোফোনের যুগে যে বাংলা গান শুনেছে, তার প্রধান কৃতিত্ব সুরকার, কণ্ঠশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পীদেরই পাওনা। বাণিজ্যিক গানের প্রয়োজনায় যন্ত্রীদের ভূমিকা যে কত বিশিষ্ট ও অপরিহার্য তা কেউ সচরাচর বলেন না। গ্রামোফোন রেকর্ডিংয়ের প্রথম যুগে বাজনা থাকত খুব

কম, কারণ রেকর্ডিং পদ্ধতি তখন এতই অনগ্রসর ছিল যে বেশি বাজনা ধ্বনির দিক দিয়ে কোনও কাজেই লাগত না। তা ছাড়া, বিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকে শহরে এত যন্ত্রীও হয়ত ছিলেন না। রেকর্ডিং প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে একদিকে আরও বেশি বাজনা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়ে ওঠে, আর অন্যদিকে নানান বাজনা শিখে রপ্ত করার দিকেও নিশ্চয়ই মন যায় আরও বেশি মানুষের। মনে রাখা দরকার, উনিশ শতক থেকেই কিছু দক্ষ ইউরোপীয় যন্ত্রী এবং অর্কেস্ট্রা পরিচালক কলকাতায় বাস করতে শুরু করেন। সাহেব ও সাহেবি রুচির বাঙালি উচ্চবিত্তদের বিনোদনের জন্য অর্কেস্ট্রার ব্যবস্থা ছিল। এই যন্ত্রীদের কাছে আমাদের দেশের মানুষ ক্রমেই বেশি সংখ্যায় তালিম নিতে থাকেন। স্মরণীয় এটাও যে, বিভিন্ন ইউরোপীয় যন্ত্র ইউরোপীয়দের সঙ্গে এ দেশে এসে পড়েছিল অনেক আগেই। আমাদের সাধারণ, এমনকি গ্রামের শিল্পীদের মধ্যেও ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের কদর যে কতটা ছিল, তা যাত্রার আবহ সঙ্গীতে কর্নেট, ক্ল্যারিনেট, বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রের প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায়।

তেমনি অতীতেও দেখা-শোনা যেত, আজও দেখা-শোনা যায় কলকাতার চিৎপুরের সাধারণ ব্যান্ডপার্টিগুলিতে আমাদের দেশের সাধারণ শিল্পীরা ড্রাম্‌সের তালে তালে ক্ল্যারিনেট, টিউবা, ট্রাম্পেট ইত্যাদি পাশ্চাত্যের যন্ত্র দিয়ে জনপ্রিয় দিশি গানের সুর বাজাচ্ছেন। দীর্ঘকাল এই ব্যান্ডপার্টিগুলি আমাদের দেশের বিভিন্ন উৎসবের অঙ্গ থেকেছেন, আজও আছেন। আরও কম-খরচের 'তাসা'-পার্টিতেও বিভিন্ন কাড়া, নাকড়া (বা নাগরা), ঢোলক ইত্যাদি তালযন্ত্রে অনবদ্য—উদ্দাম তাল বাজতে থাকে, আর মূল গানটি বাজে ক্ল্যারিনেট, ওবো, সানাই এবং গত কিছু বছর যাবৎ বৈদ্যুতিক 'টাইসোকোটো' যন্ত্রে। যন্ত্রীরা সকলে নিতান্ত সাধারণ ঘরের মানুষ। পাশ্চাত্য সঙ্গীত শেখার সুযোগ তাঁরা কোথাও পাননা। কিন্তু পাশ্চাত্যের যন্ত্রগুলি তাঁদের আপন।

আশ্চর্য, একাধিক ইউরোপিয় দেশ (ব্রিটেন সবচেয়ে দীর্ঘকাল) আমাদের উপমহাদেশে উপনিবেশ গেড়েছিল। অথচ এই ভূখণ্ডের একটি বাজনা বা সঙ্গীত-আঙ্গিককেও তারা কেউ তাদের সঙ্গীত সৃষ্টিতে টেনে নিতে পারেনি। এদিক দিয়ে তারা কতো দরিদ্র, দীন। আমাদের সাধারণ মানুষ, শিল্পী কিন্তু নিজেদের বাদ্যযন্ত্রগুলির পাশে ইউরোপীয় বাজনাগুলিকে স্থান দিয়েছে—আপন আঙ্গিকে, ভালবেসে। আর্থিক দিক দিয়ে আমাদের উপমহাদেশ দরিদ্র। কিন্তু এই ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষ সঙ্গীতে ঢের বেশি বিত্তশালী ও উদার পাশ্চাত্যের চেয়ে। রবিশঙ্করের মুন্সিয়ানার স্বাদ পেয়ে, শুনেছি, তস্‌কানিনির মত সঙ্গীতকার এমনভাবে সিমফনি রচনা করেছিলেন যাতে রবিশঙ্কর তাতে বাজাতে পারেন। কিন্তু পাশ্চাত্যে সেতার ও তবলা যন্ত্রদুটি সমাদর পেয়েছে ভারতীয় শিল্পীদের কৃতিত্বের কারণেই।

কলকাতায় বেতার অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর একজন প্রসিদ্ধ বেতারকথক ও শিল্পী নিয়মিত ক্ল্যারিনেট বাজিয়ে শোনাতেন। কালক্রমে পিয়ানো, অর্গ্যান,

বেহালা, ভিয়োলা, চেলো, ডাবল বেস (যা মন্দ্র সপ্তকে তালে তালে বাজে), ইউরোপীয় বাঁশি, পিক্কোলো, ট্রাম্পেট ইত্যাদি যন্ত্রের দক্ষ শিল্পী তৈরি হয়ে যান। কলকাতার সঙ্গীতশিল্পে বাঙালিদের পাশাপাশি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, পাঞ্জাবি, বিহারি, উত্তরপ্রদেশি, নেপালি শিল্পীরাও বাজাতেন। একজন প্রবীণ নেপালি 'সি ট্রাম্পেট' শিল্পীর সঙ্গে আমারই আলাপ হয়েছিল ১৯৭৯ সালে কলকাতায়, বিখ্যাত jazz-শিল্পীদল 'মিঙ্গাস ডিনাস্টি' যখন কলকাতায় বাজাতে এসেছিলেন। তাঁদের কর্মশালায় বাঙালি শিল্পী প্রায় ছিলেনই না। ছিলেন বরং কয়েকজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শিল্পী এবং সেই নেপালি বাদক। অন্য দিকে, পুলিস ও সেনাবাহিনীর ব্যান্ডও স্বাভাবিকভাবেই ছিল আমাদের দেশে ব্রিটিশ উপনিবেশের কারণে। ওই দুই ব্যান্ডের প্রয়োজন মেটাতে ভারতীয়দের যন্ত্রসঙ্গীত শিখিয়ে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ শিল্পীরা। বিশ শতকের গোড়া থেকেই এই রেওয়াজ ছিল। এই সব ব্যান্ডের ভারতীয় সদস্যরা পাশ্চাত্যের পদ্ধতিতেই বাজনা বাজাতেন, ইউরোপীয় স্বরলিপিতেও পুরোদস্তুর অভ্যস্ত ছিলেন। এইভাবে একাধিক দিক দিয়ে ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রগুলি আমাদের দেশে কায়েম হয়ে উঠেছিল, সেই সব যন্ত্র শেখানোর মানুষও তৈরি হয়ে উঠেছিলেন। তবলা, পাখোয়াজ, খোল, ঢোল, ঢোলক, মন্দিরা, সেতার, সরোদ, বাঁশি, সারেঙ্গি, এস্রাজ, দিলরুবার মতো উপমহাদেশীয় যন্ত্র তো ছিলই, ছিলেন সেগুলি শেখানো ও শিখে নিয়ে বাজানোর মতো মানুষ। রেকর্ডিং প্রযুক্তির উন্নতি, গানবাজনার প্রসার, জনজীবনে বেতারের ভূমিকাবৃদ্ধি, বাংলা গানের ব্যবসার প্রসার, চলচ্চিত্রে সঙ্গীতপ্রয়োগ— এই সব কারণে পেশাদার যন্ত্রশিল্পীদের ভূমিকা ও চাহিদাও ক্রমাগত বেড়ে যায়।

খুব কম শ্রোতাই গানের প্রযোজনায় ও রেকর্ডিং-এ বাজনার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন। সঙ্গীতের কান যার আছে তিনি সবকিছুর ভেতর থেকে কেবল কণ্ঠসঙ্গীতকে আলাদা করে তুলে নেবেন এবং শুধু সেটারই রস আস্বাদন করবেন, যন্ত্রসঙ্গীতের রস আদৌ পাবেন না এটা অসম্ভব। যন্ত্রপ্রয়োগ সম্পর্কে বিশ্লষণধর্মী কোন কথাই যখন বাংলা ভাষায় প্রচলিত সঙ্গীত আলোচনা ও সমালোচনায় হয় না তখন এ-বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তেই আসা সম্ভব : 'সঙ্গীত' বিষয়টি বিচার্য নয়। শুধু তাই নয়। গানের নয়, সঙ্গীতের রসগ্রহণের ক্ষমতাও বোধহয় 'সঙ্গীত আলোচক' ও 'সঙ্গীত সমালোচকের' নেই। থাকলে তো তাঁরা যন্ত্রসঙ্গীতের দিকটা উহ্য বা নিতান্তই দায়সারা একটা জায়গায় রেখে দিতে পারতেন না। আর, সঙ্গীত বোঝার ক্ষমতা তাঁদের যখন নেই তখন 'গান'(যে বস্তুটিতে কথার সঙ্গে সুরতালও থাকতে বাধ্য) নিয়ে কথা বলা ও লেখার অধিকার তাঁদের আদৌ আছে কি? লক্ষণীয় বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র নিয়ে যে সিরিয়াস লেখালিখি হয়ে থাকে সেখানেও চলচ্চিত্রে সঙ্গীতপ্রয়োগ নিয়ে প্রায় কিছুই বলা হয় না। অথচ, নিছক নেপথ্যে ব্যবহৃত গানই নয় সঙ্গীত বস্তুটাই চলচ্চিত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। শুধু গানের কথা নিয়ে নয়, সুরতাল ও সঙ্গীত নিয়ে আমরা যদি চিন্তিত হতাম, এ-

বিষয়ে আমাদের কান ও মগজ যদি থাকত তো আমাদের মনে থাকতে পারত যে আকাশবাণীতে এককালে এস এল দাস নামে একজন বাদ্যযন্ত্র-উদ্ভাবক ছিলেন যিনি প্রচলিত কয়েকটি যন্ত্রের ভিত্তিতে নতুন বাদ্যযন্ত্র তৈরি করছিলেন: মন্দ্রবাহার ও কোয়েলা। মন্দ্রবাহার ছিল বড় মাপের একটি দিলরুবাগোছের যন্ত্র যা দাঁড়িয়ে ছড় টেনে বাজাতে হত এবং যার আওয়াজ ছিল ইউরোপিয় যন্ত্র 'চেলোর' মত-মন্দ্রস্বরবিশিষ্ট। 'চেলোর' মত হলেও মন্দ্রবাহারের ধ্বনিবৈশিষ্ট ছিল একটু আলাদা। আমার মনে আছে, ১৯৭১ সালের আকাশবাণীর একটি বিশেষ রেকর্ডিং-এ পঙ্কজ কুমার মল্লিকের পরিচালনায় কাজ করার সময় দেখেছিলাম-শুনেছিলাম মন্দ্রবাহার বাজছে। তিনি আমায় বলেছিলেন ওটি বিরল এক যন্ত্র এবং ওই যন্ত্র বাজানোর শিল্পী আর বেশিদিন থাকবে না। বাঙালি যে কী পরিমান সঙ্গীত-বিতৃষ্ণ, অসঙ্গীতমনস্ক এবং পঙ্কজ কুমার মল্লিকের দূরদৃষ্টি যে কতটা ছিল তার প্রমাণ মন্দ্রবাহার যন্ত্রটি কালক্রমে লোপ পেয়েছে। কারুর স্মৃতিকথায়, আলাপচারিতে বা লেখায় ওই যন্ত্রটির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আজ যাঁরা প্রবীণ এবং যাঁরা দাবি করেন যে কলকাতার সঙ্গীত জগতের সঙ্গে তাঁদের এককালে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তাঁদের কিন্তু মন্দ্রবাহার যন্ত্রটির কথা মনে থাকা উচিত। তেমনি 'কোয়েলা' যন্ত্রটিও ছিল ছড়-টানা, যদিও আকারে ছোট, আওয়াজে তারসপ্তকনির্ভর। মিষ্টি, চিকন আওয়াজ ছিলকোয়েলার। এই যন্ত্রটির উল্লেখও কোন প্রবীন বাঙালি সঙ্গীত-আলোচকের লেখায় পাওয়া যায় না। অথচ এগুলি ছিল বাঙালিরই উদ্ভাবন।

৩

মন্দ্র সপ্তকটি সঙ্গীতে খুব জরুরি। গানবাজনায় মন্দ্র ধ্বনিটি না থাকলে বনেদটাই যেন পাকা হয় না। এই কারণে ভারতের চার তারের তানপুরা যন্ত্রে একটি তার দেয় খরজের 'সা'। প্রথমে (রাগ অনুসারে) পঞ্চম বা মধ্যম বা নিখাদ, তারপর মধ্য সপ্তকের তারের 'সা' দুটি, শেষে খরজের 'সা'। মন্দ্রধ্বনিবিশিষ্ট এই খরজের 'সা'টি না থাকলে ধ্বনির দিক দিয়ে 'সুর' কায়েম হতে পারত না। সঙ্গীত শুধু মধ্য ও তার সপ্তক নির্ভর হলে তা ভেসে ভেসে বেড়ায়, মোকাম পায় না। আমাদের উপমহাদেশের অধিকাংশ চামড়ার তালবাদ্যে (মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, তবলা, খোল, ঢোল, বাংলা ঢোল, ইত্যাদি) চড়া আওয়াজের সঙ্গে খাদের আওয়াজেরও সংস্থান থাকে—শিল্পীরা বাঁ হাত দিয়ে এই গম্ভীর ধ্বনিটি তোলেন। তেমনি, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে, যেখানে সঙ্গীতরচনা ও অর্কেস্ট্রারচনায় বিভিন্ন যন্ত্রের ধ্বনিবৈশিষ্টের প্রতি কঠোর আনুগত্য রক্ষা করা হয়ে আসছে আজ বহু শতাব্দী ধ'রে, মন্দ্রধ্বনি এবং সেই ধ্বনিবিশিষ্ট যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। হার্পসিকর্ড, পিয়ানো, অর্গ্যান একর্ডিয়ন, ক্লাসিকাল গিটার, 'ফোক' গিটার ব্যাঞ্জো-সব যন্ত্রেই তার সপ্তকের সঙ্গে মন্দ্র সপ্তক ব্যবহার করার শুধু উপায় আছে তাই নয়, রচনায় ও বাজনার শৈলীতে তা অনিবার্য। লঘুসঙ্গীতে মন্দ্র স্বরের সঙ্গে ছন্দটিও ধরে রাখার জন্য পাশ্চাত্যে 'বেস' (bass) যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে আসছে দীর্ঘকাল। 'জ্যাজ্'-এ আজও অনেকে ব্যবহার করে থাকেন 'আপরাইট বেস' বা 'একুস্টিক ডাব্‌ল বেস'। কয়েক দশক আগেও এই 'বেস' যন্ত্রটি পাশ্চাত্যের আধুনিক গানের সঙ্গেও ব্যবহার করা হত। কালক্রমে তার জায়গা নিয়েছে 'ইলেকট্রিক বেস গিটার'। পাশ্চাত্য সঙ্গীতায়োজন পদ্ধতির প্রভাবে উপমহাদেশেও তিনের দশকের পর থেকে আধুনিক গানের রেকর্ডিং-এ 'ডাব্‌ল্ বেস' ব্যবহার করা হতে থাকে। এর ফলে সঙ্গীত প্রযোজনায় ধ্বনির দিক থেকে একটি আলাদা মাত্রা আসে। পঙ্কজ কুমার মল্লিক, অনুপম ঘটক, রবিন চট্টোপাধ্যায়ের মত সঙ্গীত পরিচালকরা তাঁদের কাজে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করতেন। পাঁচের দশকের পর থেকে এটির ব্যবহার কলকাতায় অন্তত কমে আসে। এর সঠিক কারণ আমি জানি না। এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে এই যন্ত্রের শিল্পী একটা সময়ের পর আর তৈরি হননি। যন্ত্রটিও আর আমদানি হত না। কিন্তু প্রতিবেশী বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের গানের রেকর্ডিং-এ 'ডাব্‌ল্ বেস'-এর ব্যবহার সাতের দশকেও ছিল। বাংলাদেশের সুরকার

আনোয়ার পারভেজ (বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের যে দেশাত্মবোধক গানগুলি পশ্চিমবঙ্গে খুবই শোনা যেত সেগুলির অন্যতম 'জয় বাংলা বাংলার জয়' এর তিনি ছিলেন সুরকার) নিজে এই যন্ত্র বাজাতেন। আটের দশক থেকে সারা উপমহাদেশেই লঘুসঙ্গীতের রেকর্ডিং-এ, এমনকি জলসাতেও 'বেস' যন্ত্রটি আবার ফিরে আসে 'বেস গিটারের' রূপ নিয়ে। গত দুই দশকে এই যন্ত্রটি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে রেকর্ডিং-এ। উপমহাদেশে ও বাংলা গানের আধুনিক রেকর্ডিং ব্যবস্থায় কত বিচিত্র বাজনা যে ব্যবহার করা হয়ে আসছে শুধু তারই ভিত্তিতে আধুনিক সঙ্গীতের বিবর্তন বিষয়ে জরুরি গবেষণা সম্ভব। পাশ্চাত্যে তা আগেই হয়ে গিয়েছে, কারণ সেখানে সঙ্গীত বিষয়টিকে তার যোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সঙ্গীত নিয়ে ইতিহাসনিষ্ঠ আলোচনা আজও শুরু হতে পারেনি, কারণ আসলে আমরা সঙ্গীত নিয়ে চিন্তিত নই। ফলে, বাংলা গান বিষয়ক আলোচনায় বাজনা ও যন্ত্রসঙ্গীত বিষয়টি স্থান পায় না। গানের রেকর্ডিং-এ, বেতার অনুষ্ঠানে ও চলচ্চিত্র শিল্পে যন্ত্রীদের ভূমিকাও অনুল্লেখিতই থেকে যায়।

বাঙালির গান শোনার আনন্দের উৎসে সুরকার, গায়ক, গীতিকারদের পাশাপাশি আমাদের দেশের অসামান্য যন্ত্রীরাও ছিলেন। শচীন দেববর্মনের গাওয়া 'জানি ভ্রমরা কেন কথা কয় না' গানের রেকর্ডিং-এ দিলরুবা যন্ত্রের সিদ্ধপুরুষ দক্ষিণামোহন ঠাকুর তাঁর যন্ত্র দিয়ে সুরের যে উক্তি রেখেছিলেন, সেটিকে মানব সভ্যতার একটি সেরা সম্পদ বললে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না। এ রকম উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। তেমনি, বাংলা গানের সুরকারদের সৃজনবৈচিত্র্যের পাশে সে-গানের গীতিকারদের অবদান যে তুলনামূলকভাবে কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ ছিল, এই উক্তির পক্ষেও উদাহরণ দেওয়া যায় যথেষ্ট। গুণী গীতিকার কিছু কম ছিলেন না। অজয় ভট্টাচার্য, সুবোধ পুরকায়স্থ, বাণী কুমার, হীরেন বসু, প্রণব রায়, পবিত্র মিত্র, মোহিনী চৌধুরি, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শ্যামল গুপ্ত পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়— এঁদের লেখা গান আধুনিক যুগের বাঙালি দীর্ঘকাল শুনেছে। কিন্তু বাংলা গান যাঁরা ভালবেসেছেন, তাঁরা যদি নিজেদের প্রশ্ন করেন, যে গানগুলি তাঁদের মনে আজও ছোটবড় ঢেউ তোলে, সেগুলির মূল আবেদন কী কথায়, নাকি সুরে ও কণ্ঠশিল্পীদের গায়কীতে, তাহলে উত্তরটা হয়ত তাঁরা নিজেরাই পেয়ে যাবেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উক্তির প্রসঙ্গ টানা যেতেই পারে। কিন্তু এ প্রশ্নও কম গুরুত্বময় হবে না যে, ভাষা যখন একটা আছেই, গান লেখা ও সে-গানে সুরারোপ করা যখন হচ্ছেই, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রয়োগে নানান পরীক্ষানিরীক্ষা যখন হয়েই চলেছে, আমাদের দৈনন্দিন জীবন, ভাবনাচিন্তা, আবেগের অভিব্যক্তি, বাচনভঙ্গি যখন একজায়গায় থেমে নেই, তখন বাংলা গানের কথায় কেন বড্ড বেশি কাল ধরে একই বিষয়, একই ধরনের রূপকল্প ও বাক্‌ভঙ্গি চলতে থাকবে? গীতিকারদের মধ্যে যাঁদের রচনায়

আধুনিক কাব্যগুণ ও কল্পনার জোর ছিল, তাঁদের লিরিক তো নিজগুণে আলাদা মাত্রা পেয়েছেই, তা ছাড়াও সে-লিরিক আরও স্মরণীয় হয়ে উঠেছে তাঁদের আশপাশের অন্য গীতিকারদের রচনার একমাত্রিকতার কারণেও: অজয় ভট্টাচার্য, মোহিনী চৌধুরি, পরেশ ধর, সলিল চৌধুরি, মুকুল দত্ত, অমিয় দাশগুপ্ত, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য, এঁদের সকলের কৃতিত্ব এক মাপের নয়। তেমনি, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কোন কোন গানেও পাওয়া গিয়েছে ব্যতিক্রমী কল্পনাবৈশিষ্ট্য ও কাব্যগুণ, যেমন মান্না দে-র সুর করা গাওয়া 'কত দূরে আর নিয়ে যাবে বল', অথবা নচিকেতা ঘোষের সুর করা ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে', 'ঝাউয়ের পাতা ঝিরঝিরিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গায়' ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলা গানের প্রধান উপজীব্য ছিল প্রেম। বিশ শতকের তিনের দশক থেকে আটের দশক পর্যন্ত বাঙালি যত গান বেতার ও রেকর্ডে শুনেছে, ভক্তিগীতি ও পল্লীগীতি বাদে তার প্রায় সবটা জুড়ে প্রেমই বিরাজ করেছে। অভ্যাসের পৌনঃপুনিকতার মধ্যে দিয়ে 'প্রেম'ই হয়ে দাঁড়িয়েছিল আধুনিক বাংলা গানের প্রধান উপজীব্য। তারই মধ্যে যশোদাদুলাল মণ্ডল নামে (শুনেছি তিনি একজন চিকিৎসক ছিলেন) একজন শিল্পী 'ক্যালকাটা নাইন্টিন ফর্টিথ্রি অক্টোবর' (Calcutta 1943 October) নামে একটি গান রেকর্ড করেছিলেন। চমকপ্রদ সেই গান (শুরুই হচ্ছে ইংরেজি কথা দিয়ে) ছিল, লিরিকের দিক দিয়ে, সেই সময়ের একটি ছবি। তাতে কোন প্রেমের আলেখ্য ছিল না। ছিল যুদ্ধের সময়ে কলকাতার অবস্থার কথা। 'সি আর পি মিলিটারি/ পথে পথে ভিখিরি/ সব জিনিসের বাড়ল দর/ ক্যালকাটা নাইন্টিন ফর্টিথ্রি অক্টোবর।' সচরাচর কেউ এই গানটির উল্লেখ করেন না। আরও অনেক কৌতূহলোদ্দীপক গানের সঙ্গে এটিও হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার মত— সুরতাল-গায়নশৈলীর দিক দিয়ে একটি নিখাদ আধুনিক বাংলা গানের সেই লিরিক ছিল আক্ষরিক অর্থে নাগরিক চেতনা-অদ্ভুত। অর্থাৎ এমন নয় যে, 'প্রেম' ছাড়া অন্য বিষয়ে কেউ আধুনিক বাংলা গান বাঁধতে চেষ্টা করেননি, কিন্তু আধুনিক বাংলা গানের সৃষ্টি, ব্যবসা ও চর্চার ধারাবাহিকতায় কালক্রমে 'প্রেম'ই হয়ে পড়েছিল লিরিকের সবচেয়ে চর্চিত বিষয়। এর ফলে আধুনিক গানের বিষয় ও আবেদন একপেশে হয়ে পড়েছিল।

পাশ্চাত্য লঘু সঙ্গীত বলতে আমাদের দেশের বেতারে ইংরিজি গানই শোনা যেত এবং শোনা যায়। তিন, চার ও পাঁচের দশকে ইংরেজিভাষী দুনিয়াতেও প্রেমের গানের রেকর্ডই বেশি শোনা যেত। আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের গানবাজনার (এখন এঁদের আর ওই নামে ডাকা হয় না, বলা হয় 'আফ্রিকান-আমেরিকান', যেটা যুক্তিসঙ্গত) নিজস্ব কিছু আঙ্গিক ছিল, যেগুলিতে প্রেম ছাড়াও অন্য বিষয় স্থান পেত। গস্পেল ও স্পিরিচুয়ালে মাঝেমধ্যে শোনা যেত বর্ণবাদী সমাজে তাঁদের জীবনের টানাপোড়েন ও বিষাদের কথা। এঁদের পূর্বপুরুষ-পূর্বনারীদের

জোর করে ধরে আনা হয়েছিল আমেরিকায় এবং তাঁদের বিক্রী করে দেওয়া হয়েছিল ক্রিতদাস হিসাবে।

আফ্রিকান-আমেরিকানদের গানে শোনা গিয়েছে: *'Nobody knows the troubles I've seen / Nobody knows but you Jesus.'* অথবা *'Sometimes I feel like a motherless child.'* কালক্রমে আফ্রিকান-আমেরিকানদের সঙ্গীত-আঙ্গিক (Blues, Jazz) শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পীদেরও আপন হয়ে ওঠে। ছয়ের দশক থেকে আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গরা নাগরিক অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে অহিংসা আন্দোলন শুরু করেন। তেমনি কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের মধ্যে সাধারণভাবে এক রাজনৈতিক জাগরণ দেখা দেয় — শ্বেতাঙ্গপ্রধান সমাজে তাঁদের অবস্থান ও মর্যাদার প্রশ্নে। তার পাশাপাশি শ্বেতাঙ্গ সমাজেও, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে, দেখা দেয় অভূতপূর্ব এক রাজনৈতিক চেতনা — ভিয়েতনামে আমেরিকার গায়ে-পড়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং তৃতীয় বিশ্বের মানুষের সংগ্রামী তৎপরতার পক্ষে। ছাত্রছাত্রীদের একটি অংশ আমেরিকার ধনবাদী সমাজের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে আরও সাধাসিধে, আরও সরল জীবনযাত্রার সন্ধানে ভারত ও ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। দেখা দেয় প্রতিবাদী বীটনিক ও হিপি সংস্কৃতি। তেমনই, ছয়ের দশকের গোড়ায় কিউবার বিপ্লবের তরঙ্গ আমেরিকার প্রগতিশীল ও বামমনস্কদের মনেও নাড়া দেয় প্রবলভাবে। এইভাবে, নানান দিক দিয়ে আমেরিকার সমাজে একটা বড় ধরণের আলোড়ন দেখা দেয়। সাহিত্যে ও গানবাজনাতেও এর লক্ষণীয় প্রভাব পড়ে। তার আগের দেড় দশকে ক্ষণজন্মা লোকশিল্পী ও 'সংরাইটার' উডি গাথরি ও তাঁর বন্ধু পীট সীগারের তৈরি গানগুলির মধ্যে দিয়ে যুগোপযোগী গান রচনা ও পরিবেশনার একটি দৃঢ় বনিয়াদ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, উডি গাথরির নেতৃত্বে আমেরিকায় লোকগানের নবজাগরণের অর্থ কিন্তু এই ছিল না যে শিল্পীরা শুধু সনাতন পল্লীগীতি গেয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা বাস্তবজীবন, শ্রমজীবীদের জীবনের সুখদুঃখ সঙ্কট, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, রাষ্ট্র ও বিত্তবান সমাজের দমননীতি ইত্যাদি নানান বিষয়ে গান লিখছিলেন, সুরও দিচ্ছিলেন, যে সুরে মাঝেমাঝেই সনাতন আমেরিকান পল্লীগীতির প্রভাব পড়ছিল। ছয়ের দশকে বিটল্‌সদের মত ভুবনজয়ী নতুন শিল্পগোষ্ঠীর গানেও ক্রমে দেখা দিতে লাগল, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও, অন্য ভাবনা। জন লেননের শান্তির গান *'Give Peace a Chance'* বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল ওই সময়ে। তেমনই বিটল্‌সদের পর নতুন গান-কারিগরদের সারিতে বব ডিলান তাঁর আশ্চর্য কাব্যগুণসমৃদ্ধ গানগুলির দরুণ প্রায় প্রফেট হয়ে দাঁড়ালেন পশ্চাত্যের তরুণ সমাজের। তাঁর গানেও প্রেম প্রাধান্য পেল না, প্রাধান্য পেল যুগচেতনা, ব্যক্তিভাবনা। ছয়ের দশকে সারা বিশ্ব যুবশক্তির যে স্ফূর্তি ও বিস্ফোরণ দেখতে পেল, তার আগুতায় নতুন গানের ভূমিকা ছিল

উল্লেখযোগ্য — পাশ্চাত্য দুনিয়ার অন্যান্য ভাষাতেও। প্রথাগত প্রেমের গান সেখানে আর আগের প্রাধান্যের জায়গা রইল না। নতুন গান-কারিগররা প্রেমের গানও লিখতে লাগলেন অন্য মেজাজে। মনে রাখা দরকার, কিউবার বিপ্লব, তারপর গোটা লাতিন আমেরিকা জুড়েই মার্কিন প্রভুত্ববাদ-বিরোধী চেতনা, জনগণের মুক্তি আকাঙ্খা, দারিদ্র ও বৈষম্যমোচনের লক্ষ্যে নানান র‍্যাডিকাল চিন্তা ও কাজের ধারাবাহিকতা, বৈপ্লবিক তৎপরতা, ১৯৭৯ সালে নিকারাগুয়ায় সানদিনিস্তা বিপ্লবীদের রাষ্ট্রিকমতা দখল, গুয়াতেমালা ও এল সালভাদরে বৈপ্লবিক উদ্যোগ, মার্কিন সরকারের নিরবিচ্ছিন্ন দাদাগিরি ও গুণ্ডামি — এই সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে গোটা লাতিন আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকাজুড়ে 'নিউ সং' আন্দোলন প্রবল উৎসাহে এগিয়েছিল আটের দশক পর্যন্ত। এই 'নিউ সং'-এর এক্তিয়ারে যাঁরা গান লিখেছিলেন, গাইছিলেন, তাঁদের গানে ধারা দিচ্ছিল জীবনের নানান বিষয়। তাতে প্রেমও ছিল। কিন্তু তা সাবেক বাজার-চলতি প্রেমের গানের ধারার অঙ্গ আর ছিল না। তাঁদের প্রেমের গান তখন তাঁদের সার্বিক জীবনদর্শনের অঙ্গ। সাতের দশকের গোড়ার দিক থেকে লেনার্ড কোহেন নামে ক্যানাডার যে 'সংরাইটার' ও গায়ক ধূমকেতুর মত উদয় হন, তাঁর প্রায় প্রতিটি গান দার্শনিক অভিব্যক্তি। প্রেমের গানও। তেমনি, জার্মান ভাষায় ভল্‌ফ রিয়ারমানের গানেও ধরা দিচ্ছিল ব্যক্তিজীবন, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন উচ্চারণ। এই সব শিল্পীদের গানের মধ্যে দিয়ে কয়েক দশক ধরে পাশ্চাত্যের আধুনিক গান অর্জন করে নিচ্ছিল নতুন নতুন সংজ্ঞা, যেগুলির সঙ্গে চার ও পাঁচের দশকের বাজারচলতি গানগুলির বিষয়গত ও মানসিকতাগত তেমন মিল ছিল না আর। ভাষাটা ইংরিজি, জার্মান বা ফরাসি হলেও ভাষার ব্যবহার, বিষয়বস্তু আর আঙ্গিক হয়ে পড়েছিল আলাদা।

অশ্চর্য, আধুনিক বাংলা গানে কিন্তু চার থেকে আট দশক পর্যন্ত লিরিকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে নামমাত্র কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া চিরাচরিত ধারার বাইরে বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। আধুনিক সমাজ, নগরজীবন পরিবর্তনশীল। এমন নয় যে, তিনের দশক থেকে আটের দশক অবধি আমাদের সমাজ এক জায়গায় থেমে ছিল। মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে সমানে পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল। সত্যি বলতে, আমাদের উপমহাদেশে এবং আমাদের দেশে, সমাজের স্তরে স্তরে, ব্যক্তিজীবনে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে, মনোভাবে কয়েক দশক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তো বটেই। এর প্রভাব বাস্তব জীবনে, মানুষের মন-মানসিকতায় পড়তে বাধ্য এবং তা পড়ছিলও, কিন্তু আধুনিক বাংলা গানের মূল বিষয় হিসেবে থেকে যাচ্ছিল সেই প্রেম। শুধু তাই নয়। সে-প্রেমের অভিব্যক্তিও প্রথাসর্বস্ব। অজয় ভট্টাচার্যের লিরিকে উল্লেখযোগ্য কাব্যগুণ ছিল। সুবোধ পুরকায়স্থ, শৈলেন রায়, প্রণব রায়, হীরেন বসু, নির্মল ভট্টাচার্য, পবিত্র মিত্রর লিরিক শুনে আজও বোঝা যায় বাংলা গান লেখার রীতি

তাঁদের দখলে ছিল। কাব্যগুণ যে অনুপস্থিত তাও সর্বাংশে বলা যাবে না। কিন্তু লিরিকগুলি কোন দিক দিয়েই সেই তিন ও চারের দশকের প্রথাগত গান-মানসিকতা ছেড়ে বেরতে পারেনি। মোহিনী চৌধুরী ছিলেন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী এই গীতিকারের লিরিক আজও আধুনিক। ঈর্ষণীয় লিরিকভাষা ও শৈলীর অধিকারী ছিলেন তিনি। 'আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়', 'জেগে আছি কারাগারে', 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান' এবং অন্যান্য গানের লিরিকে তাঁর আবেদন ত্রিকালস্পর্শী। তিনি ছিলেন বাংলার সেই কতিপয় গীতিকারের একজন যাঁদের রচনা ক্রিয়াপদের শুদ্ধ ও চলিত রূপের সহাবস্থান-দোষে দুষ্ট ছিল না। তেমনি আরও পরে মুকুল দত্ত, ভাস্কর বসু ও অমিয় দাশগুপ্তর লেখা গানে পাওয়া গিয়েছে লিরিক-ভাবনা, রূপকল্পচিন্তা, নির্মাণ ও শব্দচয়নের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। তেমনি একাধারে গীতিকার-সুরকার-গায়ক দিলীপ সরকারের গানে পাওয়া গিয়েছিল আলাদা একটা আবেদন, যেমন 'তন্দ্রা এল, বল জাগি কেমন করে' (ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য), 'কে যায় সাথীহারা মরুসাহারায়/ সর্বনাশা পথের হাসায়' (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)। কিন্তু এ-হেন দিলীপ সরকারেরও 'কাঠফাটা রোদে/পিচ ঢালা পথে/শীতের রাতে/রিক্সা চালাই মোরা রিক্সাওয়ালা' গানটি প্রমাণ করে দেয় আধুনিক বাঙালির মানসে 'গান' কতটা জীবনবিচ্ছিন্ন ছিল। সুরতালছন্দকথা মিলিয়ে গানটি শুনলে মনে হবে হাতরিক্সা টানার মত সুখকর, আনন্দদায়ক কাজ জগতে আর নেই। এটাও সমান লক্ষণীয় যে গানটি বাঁধছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক বাঙালি যিনি বা যাঁর শ্রেণীর মানুষ কোনওদিনই হাতরিক্সা চালাননি এবং চালাবেনও না। 'মোরা' রিক্সা চালাই না। যাঁরা এই কাজটি করেন, তাঁরা আধুনিক গান বাঁধেন কি? রবীন্দ্রনাথ যেটাকে 'সৌখিন মজদুরি' বলেছেন, এ হল আধুনিক বাংলা গানে তারই উদাহরণ। এ-হেন 'কৃত্রিম পণ্যে' আধুনিক বাংলা গানের 'পসরা ব্যর্থ' হয়েছে নানান সময়ে। কিন্তু শুধু এই একটি গানের জন্য দিলীপ সরকারের নেতিবাচক মূল্যায়ণ অনুচিত। 'মরণখেলার মাতনে আজ জীবন বাজি রাখবি কে/সুখের ঘরে শয্যা ফেলে শূন্য হাতে আসবি কে'র মতো লাইনও তিনি লিখতে পেরেছেন, দিতে পেরেছেন উপযুক্ত সুর।

তেমনি, পাঁচের দশকে গৌরিপ্রসন্ন মজুমদারের কিছু কিছু লিরিকে পাওয়া গিয়েছিল স্মরণীয় কাব্যগুণ ও আধুনিকতা। এমন গান তিনি বিলক্ষণ লিখেছেন যা প্রেমের গান নয়। যেমন, 'ঝাউ-এর পাতা ঝিরঝিরিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গায়', 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে' (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়/সুরকার নচিকেতা ঘোষ)। কিন্তু 'কত দূরে আর নিয়ে যাবে বল'র মতো ব্যতিক্রমী প্রেমের গান (কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার মান্না দে) লিখতে পারলেও তাঁর অধিকাংশ গানেই প্রেমের অভিব্যক্তি প্রথাগত। তারই মধ্যে এই শক্তিশালী গীতিকার নানান ছায়াছবির দৃশ্যের প্রয়োজনে এমন গান সাফল্যের সঙ্গে লিখতে পেরেছিলেন যেগুলি প্রেমের গান নয়, যেমন 'জীবননদীর জোয়ারভাটায় কত ঢেউ ওঠে পড়ে' (সতীনাথ

মুখোপাধ্যায়/ সুরকার অনুপম ঘটক)। শ্যামল গুপ্তর লিরিকেও আমরা পেয়েছি উল্লেখযোগ্য কাব্যগুণ। তাঁর লেখা 'ও আমার মনযমুনার অঙ্গে অঙ্গে ভাবতরঙ্গে কতই খেলা/বধূ কি তীরে বসে মধুর হেসে দেখবে শুধু সারা বেলা' (মান্না দে) বা 'এই ভাল এই বসন্ত নয়, এবার ফিরে যাই/দূরেই তুমি থেক/আবার কোন বসন্ত দিন তোমার আরও কাছে/ফিরিয়ে নিয়ে আসবে আমায় দেখ' অম্লান থেকে যাবে বাংলা আধুনিক গানের ইতিহাসে। প্রেমের গানেও তিনি মাঝেমাঝে এমন বাহাদুরি দেখিয়েছেন যার জুড়ি পাওয়া ভার। কিন্তু তাঁর বেশিরভাগ গানের বিষয় সেই প্রেম। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কেও একই কথা খাটে। বরং আরও পরে জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিরিকে আমরা পেয়েছি প্রথাছুট শব্দচয়ন নির্মাণ ও লিরিকচিন্তা। এমনকি প্রেমের গান লিখতে গিয়েও জটিলেশ্বর আনতে পেরেছেন দৃষ্টিভঙ্গি ও উচ্চারণের নতুনত্ব যা তাঁকে আলাদা করে দেয়: 'তোমার সঙ্গে দেখা না হলে/ভালবাসার দেশটা আমার দেখা হত না/ তুমি না হাত বাড়িয়ে দিলে এমন একটা পথে চলা শেখা হত না।' এই গানেরই শেষ লাইন : 'তুমি আখর না চেনালে আজও কিছুই লেখা হত না।'— এই যে বাচনভঙ্গি, শব্দচয়ন, এর মধ্যে প্রথানুগত্য নেই, নেই ক্রিয়াপদের সাধু-চলিত রূপের বিসদৃশ সহাবস্থান। এইখানে জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গান যুগোপযোগী হয়ে উঠতে পেরেছিল ছয় ও সাতের দশকে।

মুকুল দত্ত, ভাস্কর বসু, অমিয় দাশগুপ্ত ও শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া মোহিনী চৌধুরী পরবর্তী বেশিরভাগ আধুনিক গীতিকারের লিরিকে সাধু-চলিতের ধাক্কাধাক্কি আধুনিক বাংলা গানের দেহে এক বিপত্তি বিশেষ। এই উৎপাত বাংলা গানের আধুনিক হয়ে ওঠার পথে এক উল্লেখযোগ্য অন্তরায় হয়েই থেকে গিয়েছিল বড্ড বেশিকাল। সলিল চৌধুরির মতো নিরীক্ষামনস্ক ও সৃজনশীল সঙ্গীতকারও অনেক সময় এ দিকে মন দেননি। যুগোপযোগী, দেশি-বিদেশি সাঙ্গীতিক উপাদান মেশানো সুর ও যন্ত্রাণুষঙ্গের আবহে ছ'এর দশকে তিনি লিখেছেন : 'যদি কিছু আমারে শুধাও/কী যে তোমারে কব/নীরবে চাহিয়া রব/ না বলা কথা বুঝিয়া নাও।' অথবা 'এমন দিনে তুমি মোর কাছে নাই' (আহা ঐ আঁকাবাঁকা যে পথ যায় সুদূরে)। সুর, ছন্দ, যন্ত্রাণুষঙ্গ চূড়ান্ত আধুনিক। আর লিরিকে আমারে, তোমারে, কব, শুধাও, চাহিয়া, বুঝিয়া, মোর' নাই। ভাবলে অবাক হতে হয় যে এত আধুনিক সঙ্গীতকারও সুরের আধুনিকতা ও কথার এই সাবেকিয়ানার দ্বন্দ্ব মেনে নিচ্ছেন। তাঁর আপত্তি নেই গানের দেহে সামঞ্জস্যের এই শোচনীয় অভাবে। আটের দশকেও তিনি লিখে ফেলছেন— 'যতদূর চাহি আর কিছু নাহি' (আর কিছু স্মরণে নেই)।

আধুনিক বাংলা কবিতাতেও ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপের সহাবস্থান, 'আমার' আর 'মোর'-এর সহগমন এককালে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু বাংলার কবিরা তা বর্জন করেন। আধুনিক বাংলা গানের লিরিকে কিন্তু এই ব্যাপারটি দীর্ঘকাল বিরাজ করেছে। আধুনিক গানের কাথা, তার শব্দচয়ন, আঙ্গিক ও বাচনভঙ্গি

নিয়ে বাঙালি যে দীর্ঘকাল আত্মতুষ্টি ও মানসিক জাড্যকে মেনে নিয়েছিল, এ হল তারই প্রমাণ। দেশি-বিদেশি উপকরণ ও উপাদান মিশ্রিত আধুনিক সুর, আধুনিক আঙ্গিকে যন্ত্রপ্রয়োগের সঙ্গে সাধু-চলিত মেশানো কথার উপস্থিতি যে বিসদৃশ- এই বোধটাই বাংলা গানের নির্মাতা ও শিল্পীদের দীর্ঘকাল ছিল কিনা সন্দেহ।

পরবর্তী যুগে ও সমকালে বাংলা আধুনিক গান সম্পর্কে আধুনিক বাঙালির যে সার্বিক ধারণা তার ভেতরে এই ধরনের দ্বন্দ্ব কাজ করে গিয়েছে, এখনও যাচ্ছে। যার ফলে এই শিল্পরূপ নিয়ে আমরা সত্যিই গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছি ও ভাবছি কি না এই প্রশ্নটি এসে পড়তে বাধ্য।

তারই মধ্যে কিন্তু চারের দশক থেকে সাতের দশকের মধ্যেই নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজ দত্ত, গোপাল দাশগুপ্ত, প্রবীর মজুমদার, সুধীন দাশগুপ্ত, প্রসূন মিত্রর মতো গীতিকাররা (গোপাল দাশগুপ্ত, প্রবীর মজুমদার ও সুধীন দাশগুপ্ত সুরকার হিসেবেও স্মরণীয়)। বিভিন্ন গানে প্রমাণ দিতে পেরেছেন যে আধুনিক বাংলা গানের লিরিক রচনার সর্বজনস্বীকৃত দস্তুর তাঁদের আয়ত্বে। প্রবীর মজুমদারের কোন কোন গান, এমনকি প্রেমের গানও যেমন 'এই নীলনির্জন সাগরে' আশ্চর্য চকমকির মতো জ্বলে উঠেছে, কখনও আবার এমনিতে 'গান' না-লেখা লেখক-কবি বেতার, গ্রামোফোন রেকর্ড বা ছায়াছবির প্রয়োজনে বাংলা গান লিখে উল্লেখযোগ্য স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, যেমন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ। বিমলচন্দ্র ঘোষের লেখা 'সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা', 'শোনো বন্ধু শোনো, প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা'র লিরিকগুণ মোহিনী চৌধুরীর বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে আনতে চায় আমাদের। তেমনি, আকাশবাণীর রম্যগীতিতে তারাশঙ্করের লেখা, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুর দেওয়া ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'আমার প্রাণের রাধার কোন ঠিকানা' আজও বাংলার যে-কোন সিরিয়াস গীতিকারের কাছে একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে। দৃষ্টান্ত হতে পারে 'ডাকহরকরা' ছবিতে সুধীন দাশগুপ্তর বিস্মরণ-অসাধ্য সুরসংযোজনায় তাঁর লেখা গানগুলি।

আকাশবাণীর রম্যগীতি ছিল আধুনিক বাংলা গানের এক যুগান্তকারী পরীক্ষাগার। হিন্দি ছবির গানের দাপট রুখতে এককালের কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার সম্প্রচার দপ্তরের মন্ত্রী কেশকার পাঁচের দশকে রম্যগীতি বা সুগম সঙ্গীতের পরিকল্পনা করেন। রম্যগীতির আওতায় সুরকার, গীতিকার, কণ্ঠশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পীরা বাজারে তাঁদের কাজ জনপ্রিয় হল বা হবে কিনা, সেই দুর্ভাবনায় জড়িয়ে না পড়ে খোলা মনে গানবাজনা নিয়ে সৃজনশীল কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র ছিল অর্থদাতা। সে সময়ে সরকারি টাকায় ভারতের বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রে তাড়াতাড়ি সঙ্গীত রেকর্ডিংয়ের জন্য বিশেষ স্টুডিও তৈরি হয়ে যায়, নিযুক্ত হয়ে যান সঙ্গীত-প্রযোজক ও 'কম্পোজার'। রম্যগীতিতে যে গানগুলি রেকর্ড করা হত, সেগুলি 'স্টুডিও রেকর্ড', গ্রামোফোন ডিস্ক নয়। এই সব গান

শোনা যেত কেবল বেতারের রম্যগীতি অনুষ্ঠানে। আকাশবাণীর এই বিভাগেই জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, গোপাল দাশগুপ্ত, সুরেন পাল, আলি আকবর খান, তিমির বরণ, অনিল বাগচি, ভি বালসারা, অলকনাথ দে, নিখিল ঘোষ, দুনিচাঁদ বড়াল, সলিল চৌধুরি, প্রবীর মজুমদারের মতো সুরকাররা এমন বেশ কিছু সুরসৃষ্টি করেন যা যে কোনও সভ্য জাতির গর্বের বিষয় হওয়ার কথা। সুকুমার রায়ের কবিতায় সুর সংযোজনা এই রম্যগীতিতেই হয়েছিল। সুর করেছিলেন এবং গানগুলি প্রযোজনা করেছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সঙ্গীতাচার্য, যাঁর প্রতিভা ও সৃজনশীলতা অবিশ্বাস্যরকম। 'গন্ধ বিচার', 'রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা', 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম' ইত্যাদি গানের রেকর্ডিং-এ কণ্ঠ দিয়েছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ স্বয়ং, সঙ্গে রসজগতের আর এক বিস্ময় অজিত চট্টোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুর, পরিচালনা ও গাওয়ার রসায়ণে সুকুমার রায়ের কবিতাগুলি যে রূপ পেয়েছিল তা অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়। এমন এক্স্পেরিমেন্ট পৃথিবীতে বিরল। বাংলার নাগরিক মানসে এগুলি স্থান পেয়েছে কি? সঙ্গীত থেকে আমরা যে কতটা দূরে, তার প্রমাণ আমাদের এই বেরসিক অজ্ঞতা। তেমনি বাংলা গানের আর এক নিরঙ্কুশ 'জিনিয়াস' সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক, বাঁশিশিল্পী অলকনাথ দে-র সুরে শ্যামল মিত্রর গাওয়া 'আমার এ বেভুল প্রাণের সঙ্গোপনে', দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'সেই পাখি আজও আছে কি', নির্মলা মিশ্রর গাওয়া 'চেয়ে বসে থাকি', প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া 'যে দোলায় দোলনচাঁপা'

৪

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের রম্যগীতির ফসল।

পাঁচের দশকের মধ্যেই আধুনিক বাংলা গান নির্মাণ, অনুশীলন, প্রযোজনা ও পরিবেশনার ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে একটা নির্দিষ্ট আকার পেয়ে গিয়েছিল। কাঠামোর দিক দিয়ে : স্থায়ী, প্রথম অন্তরা, সঞ্চারী, দ্বিতীয় অন্তরা। অথবা স্থায়ী, অন্তরা, অন্তরা। কখনও তিনটি অন্তরা। কোনও কোনও বাঙালি সঙ্গীত সমালোচক বাংলা গানের কাঠামোর বর্ণনা দিতে গিয়ে 'স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ' এই পর্ববিন্যাসের কথা বলেছেন। 'আভোগ' ব্যাপারটি কিন্তু ধ্রুপদের অঙ্গ। বাস্তবে বাংলার বিভিন্ন ও মহাবিচিত্র পল্লীগীতি, শ্যামাসঙ্গীত ও আধুনিক গানের কাঠামোয় কিন্তু ধ্রুপদী 'আভোগ' মেলে না। মেলে বরং স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-অন্তরা অথবা স্থায়ী-অন্তরা-অন্তরার কাঠামো। মনে রাখা দরকার, এই নির্দিষ্ট কাঠামোর বাইরেও বাংলা গান রচিত হয়েছে। শুধু স্থায়ীর সুরের পুনরাবৃত্তিতে একাধিক স্তবকের সমাহারেও বাংলা গান তৈরি হয়েছে। আবার, স্থায়ীর পরেই অন্তরার সপ্তক-বৈশিষ্ট এড়িয়ে সঞ্চারীর মেজাজে মন্দ্র সপ্তকে যাওয়ার দৃষ্টান্তও আছে, যদিও বিরল। রবীন্দ্রনাথের 'আমি চঞ্চল হে' এর একটি স্মরণীয় উদাহরণ। যে কাঠামোগুলির কথা আমি বললাম, কয়েকটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, সেগুলিই মেনে নিয়েছিল বাঙালি, এমনকি ভারতের আরও কয়েকটি জাতি।

গীতিকার ও সুরকাররা ওই কাঠামোগুলিকে মেনেই ক্রমাগত গান বাঁধছিলেন। সাধারণ একটা রূপ এইভাবে স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছিল। তেমনি বেশিরভাগ গান শুনে মনে হয় 'প্রেম'ই যে হবে আধুনিক গানের প্রধান বিষয়, তাও মেনে নেওয়া হয়েছিল সাধারণভাবে। বাংলা সাহিত্যে, কবিতায়, সাংবাদিকতায়, বাংলার জনজীবনে সময়ের সঙ্গে যতই বিষয়গত ও ভাষাগত পরিবর্তন আসুক, বাংলা আধুনিক গানের লিরিকে ও কথা-সুর মিলিয়ে সার্বিক আবেদনে প্রেম ছাড়া অন্য কোনও বিষয় সহজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আবার বলি, ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল, যেমন সলিল চৌধুরির কিছু গান (সুকান্ত ভট্টাচার্যর কবিতায় সুর দিয়ে 'রানার', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর কবিতায় সুর দিয়ে 'পাল্কির গান', নিজের কথায়-সুরে 'গাঁয়ের বধূ', 'ধান কাটার গান', 'নৌকা বাওয়ার গান', 'সেই মেয়ে', 'পথে এবার নামো সাথী', 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে', 'প্রান্তরের গান আমার'), সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর কবিতায় অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে 'ছিপখান তিন দাঁড়', পরেশ ধরের

কথায়-সুরে 'ওরে ও মাঝি রাঙাস্বপন দেশে যাব', 'শান্ত নদীটি', 'ফুলের মত ফুটলো ভোর' (জোয়ারের গান) পরেশ ধরের লেখায় সলিল চৌধুরির সুরে 'ধিতাং ধিতাং বোলে'। লক্ষণীয়, এই সঙ্গীতকাররা সকলেই রাজনীতি-সচেতন, কেউ কেউ বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িতও ছিলেন। পঞ্চাশের দশকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া সলিল চৌধুরির দুটি গান, 'পথ হারাব বলে এবার পথে নেমেছি' ও 'দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক' প্রেমের গান নয়। মনে রাখা দরকার উল্লেখিত এই গানগুলি প্রেমের গান না হওয়া সত্ত্বেও দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। অর্থাৎ আধুনিক গানকে জনপ্রিয় ও বাণিজ্যসফল করে তুলতে হলে প্রেমের ওপরেই ভর করতে হবে, এমন কোনও দাবি বাংলা গানের শ্রোতাদের ছিল বলে মনে হয় না। থাকলে, আধুনিক বাংলা গানের সম্ভারে এই ব্যতিক্রমী গানগুলি সমাদর পেত না। অন্যদিকে, গানের লিরিকে প্রেম ছাড়া অন্য কোনও বিষয় এসে পড়লে গ্রামোফোন কোম্পানি বেঁকে বসবে, আকাশবাণীও সে রকম গানের রেকর্ড বাজাবে না তাও বলার জো নেই, কারণ ব্যতিক্রমী গান দস্তুরমতো রেকর্ডও হয়েছিল, আকাশবাণী কলকাতা থেকে নিয়মিত বেজেওছিল। অথচ, কার্যত দেখা গেল অধিকাংশ লিরিকে 'প্রেম'ই প্রাধান্য পাচ্ছে এবং তার অভিব্যক্তি হয়ে পড়ছে একই ধাঁচের। ভাবালুতা আর এক ধরনের সাজানো সুখদুঃখই হয়ে দাঁড়াল লিরিকের বৈশিষ্ট্য। আর একটি দিকও লক্ষ্য করার মতো। বয়স বাড়ার সঙ্গে মানুষের প্রেমানুভূতি ও প্রেমের প্রকাশভঙ্গি পাল্টায়। আরও পরিণত বয়স ও মানসিকতায় তা আর বয়ঃসন্ধি ও যৌবনের মতো থাকে না। বয়স্ক মানুষের জীবনে প্রেম থাকে যথেষ্টই। যৌবন-উত্তীর্ণ মানুষও প্রেমে পড়েন। কিন্তু সেই আবেগ, অনুভব ও সংরাগের প্রকাশ হয় অন্যরকম। বাংলাভাষায় এমন প্রেমের কবিতার সংখ্যা কম নয় যেগুলির উপজীব্য পরিণত বয়সের প্রেম। কিন্তু আধুনিক বাংলা গানের লিরিকে এই দিকটি আদৌ প্রাধান্য পায়নি। ফলে, পরিণত বয়সের, এমনকি প্রবীণ কণ্ঠশিল্পীদের কণ্ঠে শোনা গেছে কিশোর-কিশোরী বা সদ্য যুবক-যুবতীসুলভ প্রেমের আকুতি, যা এক কথায় বেমানান। কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও সাধারণভাবে বাংলার আধুনিক গীতিকাররা লিরিক, মানুষের আবেগ ও সংরাগের বয়সোচিত বিবর্তন এবং বেঁচে থাকার বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। সুবিচার করতে পারেননি তাঁরা বাস্তব জীবনের বিভিন্ন দিক ও মানুষের মনস্তত্ত্বের প্রতি। 'হিউমার' বস্তুটি নিদারুণভাবে অনুপস্থিত থেকেছে বাংলা গানে। তেমনি মানুষে-মানুষে সম্পর্কের যে নানান দিক আছে, যেমন বাৎসল্য, বন্ধুতা, বাবা-মাকে নিয়ে আবেগ ও ভাবনা ('মা'কে নিয়ে দু'একটি গান পাঁচের দশক থেকে যদি বা হয়েছে, 'বাবা'কে নিয়ে ১৯৯২ সালের আগে কোনও আধুনিক বাংলা গান রচিত ও রেকর্ড হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই), সেগুলিও আধুনিক লিরিকে গরহাজির। এর ফলে আধুনিক বাংলা গানে মস্ত একটা ফাঁক থেকেই গিয়েছিল এবং প্রশ্রয় পাচ্ছিল।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের সময় থেকে শুরু হল সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এবং সুনির্দিষ্টভাবে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার যুগ। আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের সময় দেওয়া হল বাড়িয়ে। গ্রামোফোন কোম্পানিগুলিও আরও বেশি সংখ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করতে লাগল। সেই সময় (৪৫ আর পি এম ও ৩৩ আর পি এম ডিস্কের যুগ এ-দেশে তখনও আসেনি) রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের অ্যালবাম বের করতে শুরু করল গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া (অধুনা সা রে গা মা)। অ্যালবামগুলি ছিল ৭৮ আর পি এমের কিছু ডিস্কের সমাহার। বাঙালি শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই জীবনে প্রথম ঘরে বসে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের গানগুলি পর পর শোনার সুযোগ পেলেন।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ থেকে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখা ও শোনার যে জোয়ার এল, তার তোড়ে আধুনিক বাংলা গান চর্চায় একটু ভাটা পড়ল। আধুনিক বাংলা গান বিষয়ে আলোচনা আমাদের দেশে কমই হয়। যেটুকু হয়ে থাকে, তাতে এই দিকটি তেমন গুরুত্ব পায় না। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষকে ঘিরে দেশ জুড়ে বিপুল সরকারি অর্থ ও লোকবল কাজে লাগিয়ে যে ব্যাপক উৎসব ও কর্মকাণ্ড শুরু হল, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর তা আর দেখা যায়নি। শিক্ষিত বাঙালি পেয়ে গেল এমন এক বিগ্রহ, যাঁর নাম নিতে পারলে সাতখুন মাপ, যাঁর নামের নিশান সর্বোচ্চ, সবার বশ্যতা আদায় করার মতো সাংস্কৃতিক ধ্বজা. যিনি, আজকের পরিভাষায় বলতে গেলে, সবচেয়ে জোরালো ও কার্যকর সাংস্কৃতিক 'আইকন'। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' এমন একটি নাম, যাঁর সম্পর্কে বিরুদ্ধাচরণের ন্যূনতম আভাস শিক্ষিত বাঙালি সহ্য করতে নারাজ। তাঁর সব কিছু প্রশ্নাতীত। গানে তাঁর সবকটি সৃষ্টি তুল্যমূল্য। 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'র মতোই উৎকৃষ্ট। সব কটি গান প্রশ্নরিক্ততায় একই ভাবে ভক্তি-গদগদ চিত্তে অনন্তকাল গেয়ে যাওয়া যায়। শ্রোতারাও সেগুলি এই বিশ্বসংসার যতদিন থাকবে ততদিন একই ভাবে, ভক্তিভরে শুনে যাবেন— শিক্ষিত, সংস্কৃতিমান বাঙালির বোধহয় এটাই দাবি। মোট কথা, কারুরই সমস্ত কাজ ও সৃষ্টি যে সমমাত্রিক উৎকর্ষের দাবিদার হতে পারে না, কোনও কোনও গান যে কারুর কারুর একটু বেশি বা কম ভাল লাগতে পারে, এই কথাগুলি অন্য যে কোনও স্রষ্টার ক্ষেত্রে বাংলার শিক্ষিত শ্রেণীর একটি বড় অংশ মানতে রাজি। কেবল রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা উঠলেই সে সম্মতি আর যেন থাকতে চায় না। এতদিন পর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাঙালি হয়ত আগের চেয়ে একটু স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু ছয়ের দশকে বিরাজ করছিল অন্য অবস্থা। আধুনিক বাংলা গানকে সম্বল করে সাংস্কৃতিকভাবে জাতে ওঠার কোনও সুযোগ ছিল না। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কেন্দ্র করে সেই সুযোগ মিলল। এর ফলে আধুনিক গানের জুটতে লাগল উপর্যুপরি

অনাদর, অবহেলা।

ছয়ের দশকে, আমি তখন ছাত্র, শিক্ষিত বয়স্ক কোনও বাঙালি আমায় গান গাইতে বললে আমি যদি আমার প্রিয় কোনও আধুনিক গান শোনাতাম, তো তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাক সিঁটকে বলে উঠতেন, 'এ মা, এ আবার কী গান! রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে না যে!' বেতারে আমি ১৯৬৬ সাল থেকে আধুনিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীত দুই-ই গাইতাম বলে বিভিন্ন সময় শিক্ষিত বয়স্করা (বলা বাহুল্য বাঙালি) আমায় বলেছেন, 'আবার ওই ছাইপাঁশ আধুনিক গান কেন? শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেই তো হয়।' যে আধুনিক গানগুলি তখন ও তার পরে বেতারে গাইতাম, সেগুলি আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকারদের লেখা এবং আমার সুর করা। গানগুলির লিরিক নোবেল জয়ের যোগ্য কাব্যগুণসমৃদ্ধ ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে স্থূল বা আনাড়ি হাতের ফসলও ছিল না। বাঙালির সঙ্গীতমানসের অন্তত আরও দুই 'আইকন' অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তর অধিকাংশ গানের চেয়ে সে দিনের কিছু গীতিকারের রচনা খারাপ ছিল না মোটেও। সে কথা সবিনয়ে জানাতে গিয়ে প্রচুর বকুনিও খেয়েছি অনেক বয়স্ক মানুষের কাছে, যাঁদের বেশিরভাগই আসলে বেরসিক, সুর-বধির। এই ধরনের কর্তাভজা 'ডগমা' যে সমাজে বা লোকস্তরে সজীব থাকে, সেখানে সৃজনশীলতা প্রশ্রয় পেতে পারে না।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ ও রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চাধিক্যের ধাক্কায় আধুনিক বাংলা গানের হাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল কতকটা দুয়োরানীর মতো। ভদ্রলোকে ঠিক পুঁছতে চায় না, অথচ তা হয়ে চলেছে। অত বড় একটা ক্ষেত্র। এত গুণী, সৃজনশীল মানুষ দীর্ঘকাল এই ক্ষেত্রে কর্মরত। বেশ কিছু স্মরণীয় গান আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এঁরা। অথচ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, কাজী নজরুল ইসলামের গানের যে সাংস্কৃতিক কুলমহিমা, তা আধুনিক গানের নেই। হিমাংশু দত্ত, অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, সুধীরলাল চক্রবর্তীর মতো সুরকারদেরও বাঙালি তার সাংস্কৃতিক 'আইকন'দের পাশে বসাতে নারাজ। এও এক বিচিত্র ব্যাপার। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি এক শ্রেণীর 'শিক্ষিত' বাঙালি সগর্বে ঘোষণা করে আসছেন—'আমি শুধু ক্লিসিকাল মিউজিক শুনি।' আর-এক দল : 'আমি ভাই রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর কিছু শুনি না।' সুলতালছন্দ যাঁদের কিছু বলে, যাঁদের মস্তিষ্কে বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলে থাকে, তাঁরা কখনও এমন কথা বলতে পারে না। এ-বুলি যাঁরা আওড়ান তাঁদের সুরবধির ও সঙ্গীতবধির ছাড়া আর কিছু বলার জো আছে কি? কেউ কেউ আবার গদগদ চিত্তে সেই নিধুবাবু-ধরণের বৈঠকী গানেই থেকে গিয়েছেন। আর-এক শিবির চারের দশকে আটকে গিয়ে ঘুরে চলেছে কেটে-যাওয়া গ্রামোফোন ডিস্কের মতো। এঁরা সকলেই কিন্তু ভয়ানক সঙ্গীতবোদ্ধা।

ছয়ের দশকে দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এল নজরুলগীতির জোয়ার।

রবীন্দ্রনাথের মতোই কাজী নজরুল ইসলাম সহস্রাধিক গান রচনা করেছিলেন। ছয়ের দশকের আগে গ্রামোফোন রেকর্ডে তার সামান্যই ধরা ছিল। নজরুল-প্লাবন শুরু হতে গ্রামোফোন কোম্পানিগুলি অনেক বেশি সংখ্যায় নজরুলগীতির রেকর্ড বের করতে শুরু করল। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি এতদিন আধুনিক গানের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ও সুরকার হিসেবেই পরিচিত ছিলেন, এবারে নজরুলগীতির ডাকসাইটে শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। বড় বড় প্রেক্ষাগৃহে শুরু হল তাঁর নজরুলগীতির একক অনুষ্ঠান। কোনও বাঙালি কণ্ঠশিল্পীর একক অনুষ্ঠান ছয়ের দশকের কলকাতায় এক নতুন সংযোজন। তেমনি, বাংলা গানের আসরে শুরু হল আর এক নতুন ব্যাপার : রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা। একজন শিল্পী রবীন্দ্রসঙ্গীতে, আর একজন নজরুলগীতিতে। ছয়ের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি পেরিয়ে এই রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা অনেক শ্রোতা টানতে পেরেছে। লক্ষ্যণীয় : ১) শিক্ষিত, সংস্কৃতিমান বাঙালি সেই সময়ে তাঁদের গানের দুটি 'আইকন'কে অভ্যেসের পৌনঃপুনিকতার মাধ্যমে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। ২) আধুনিক বাংলা গান (যার মধ্যে হিমাংশু দত্তর গানও পড়ে যায়, যদিও 'হিমাংশুগীতি' নামটি কেউ কেউ ব্যবহার করতেন) সাংস্কৃতিকভাবে মর্যাদা পেল না, যদিও সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে তার একটা জায়গা থেকে গেল।

এই দ্বিতীয় ব্যাপারটির দিকে তাকালে দেখা যাবে, ছয়ের দশক থেকেই আধুনিক বাংলা গান 'বেসিক সং' (অর্থাৎ ছায়াছবি বা নাটকের জন্য রচিত নয় এমন গান) ও ছায়াছবির গানের রেকর্ড হিসেবে বাজারে হাজির থাকলেও, তার জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল হিন্দি ছবির গান। বাংলা চলচ্চিত্রের বাজার তখনও শক্তিশালী। একাধিক হিন্দি ছবির হিরো ততদিনে পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও, উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তা কমিয়ে দেওয়ার মতো শক্তি তাঁদের ছিল না। তার মধ্যে বিশ্বজিৎ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যথেষ্ট আকর্ষণীয়। তেমনি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাও ছিল রীতিমতো ওজনদার। অনিল বাগচি, নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্রর সুরের এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের আবেদন বাংলা চলচ্চিত্রে তখনও অম্লান। কিন্তু তা হলেও, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি ছায়াছবি ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ছবির গানও জনপ্রিয়তার হিসেবে বাংলা আধুনিক গানের চেয়ে বেশি জোরে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে ততদিনে। আমার মনে আছে, ১৯৬৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর আর্টস কলেজে যে নবীনবরণ উৎসব হল, তাতে একজন বহিরাগত শিল্পী শুধু হিন্দি ছবির গানই গাইলেন। এই ধরনের অনুষ্ঠান ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগল। তার কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা দেখতে পেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের

অন্য কলেজগুলির বিনোদন অনুষ্ঠানে বাংলা গানের পাশাপাশি হিন্দি গান যথেষ্টই হচ্ছে। গোটা পশ্চিমবঙ্গের কথা বলতে পারব না, তবে কলকাতার অন্যান্য কলেজের অনুষ্ঠানেও যে হিন্দি গান যথেষ্টই ছিল, আমরা, সে-যুগের নবীনের দল তার সাক্ষী। ১৯৭০-৭১ সালে, দক্ষিণ কলকাতার কোনও কোনও মুক্ত অনুষ্ঠানে বন্ধুবান্ধবদের সৌজন্যে কিছু অনুষ্ঠান করতে গিয়ে দেখেছিলাম আমার মতো কোনও বাঙালি শিল্পী একটি বাংলা গান গাওয়ার পরই জনতা 'হিন্দি হিন্দি' বলে চিৎকার করছে। আরও ঢের বেশি নামজাদা বাঙালি গায়ক-গায়িকাদের বেলা ঠিক এতটা না হলেও, মাঠ-ময়দানের অনুষ্ঠানে পর পর খানতিনেক বাংলা গান হয়ে যাওয়ার পর বাঙালিরাই উশখুশ করতেন এবং হিন্দি গানের দাবি জানাতেন। ছয় ও সাতের দশকে এক শ্রেণীর বাঙালি গায়ক-গায়িকাকে পাওয়া গিয়েছিল, যাঁদের নিজেদের কোনও জনপ্রিয় গান ছিল না। তাঁরা অর্কেস্ট্রা সঙ্গে আনতেন এবং সাধারণত একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার পরই হিন্দি গান গাইতেন একের পর এক। এই শিল্পীদের খুব কদর ছিল। কণ্ঠশিল্পী হিসেবে এঁরা বিরাট দক্ষতার অধিকারী না হলেও, নেহাত ফেলনা ছিলেন না। তেমনি, দু'একজন বাঙালি শিল্পী সে যুগে অনুষ্ঠানসফল হয়ে উঠেছিলেন যাঁরা শুধু হারমোনিয়াম আর তবলা নিয়ে গাইতেন— জনপ্রিয় বাংলা ও হিন্দি গান। এঁদের মধ্যে মলয় মুখোপাধ্যায় বেশ তৈরি গায়ক ছিলেন। একাধিকবার প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে তাঁর গান শুনেছি ছয়ের দশকের শেষে। তিনি মান্না দে-র রেকর্ড করা বাংলা ও হিন্দি গান গেয়ে আসর মাত করতেন। একটি অনুষ্ঠান করে ফেরার পথে মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান তিনি। আমরা হারালাম এক প্রতিভাবান তরুণ গায়ককে। মৃত্যুর আগে তিনি একটি আধুনিক বাংলা গানের রেকর্ড করে গিয়েছিলেন। দুটি গানই আমার আজও

মনে আছে : 'শ্রীমতি যে কাঁদে' আর 'কিছু নেই তবু দিতে চাই।'

পাঁচের দশকের প্রথম দিকেই পশ্চিমবঙ্গে যে পুরুষ কণ্ঠশিল্পীরা আকাশবাণী কলকাতার অনুষ্ঠান (যা সে যুগে 'লাইভ' ছিল, পরে 'টেপরেকর্ডিং' চালু হয়) ও গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে শ্রোতাদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং কারুর কারুর ক্ষেত্রে যে পরিচিতি বিপুল খ্যাতিতে পরিণত হয়, তাঁরা ছাড়াও পাঁচের দশকের শেষদিকে আরও অন্তত দু'জন গায়ককে আমরা পেয়েছিলাম যাঁরা সে সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তার অধিকারী না হলেও অনেকের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন। সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সময়ের বিচারে এঁদের দু'জনকে পাঁচের শিল্পীই বলতে হয়, যদিও সতর্কতার সঙ্গে, কারণ পাঁচের গোড়ার দিকের শিল্পীদের সারিতে এঁরা ছিলেন না। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় নিজে গীতিকার ও সুরকারও ছিলেন (এখনও আশা করি তাই-ই আছেন)। শুধু তাই নয়, ছয় ও সাতের দশকে তাঁর বেতার অনুষ্ঠানগুলির জন্য কেউ কেউ উন্মুখ হয়ে থাকতেন, কারণ তাঁর লেখা গানে একটি আলাদা মাত্রা পাওয়া যেত। সাতের দশকের মাঝামাঝির মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গে যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও হানাহানি তুঙ্গে, বেতারে শোনা জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের স্বরচিত গান 'এ কোন সকাল রাতের চেয়ে অন্ধকার' ও 'এ কেমন রাত পোহাল দিন যদি আর এল না' আমার কাছে অন্তত আধুনিক বাংলা গানের একমাত্র যুগোপযোগী উচ্চারণ বলে মনে হয়েছিল। বস্তুত, অমন কালোপযোগী বাংলা গান তার আগেও শুনিনি, পরেও বিশেষ না। সাতের দশকের গোড়ার দিকে 'এ কেমন রাত পোহাল' গানটি বেতারে আরও কোনও কোনও শিল্পীকে গাইতে শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের একটি বাক্য অনেক সুধী বারবার উদ্ধৃত করেছেন— 'জীবনে জীবন যোগ করা।' এটি না হলে 'গানের পসরা' কৃত্রিমতায় ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা রবীন্দ্রনাথের ছিল। তাঁর যে উত্তরসূরীরা পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক বাংলা লিখে যাচ্ছিলেন, প্রথামাফিক গান লেখার ক্ষমতা তাঁদের অনেকের থাকলেও আধুনিক গানে 'জীবনে জীবন যোগ করার' কাজটি তাঁরা বিশেষ করে উঠতে পারছিলেন না। এ কাজটি করতে পারলে বাংলার শ্রোতা তার পরিচয় পেয়ে যেত, কারণ বেতার ছিল দীর্ঘকাল আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাড়িতে বসে, লোককর্ণের অন্তরালে কেউ যদি তেমন কাজ করে থাকেন তো সেটি অন্তরালেই থেকে গিয়েছে। প্রকাশ্যে যা

শোনা গিয়েছে তার ভিত্তিতে বলতে হয় ছ-এর দশকের শেষ দিক থেকে শুরু করে সাতের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমাদের সমাজে নিত্যজীবনের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তার পরিসরে জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত দুটি গানে জীবন যুক্ত হয়েছিল জীবনের সঙ্গে। আটপৌরে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলে গেল গানের জীবন। গানকে সারাক্ষণ বা থেকে থেকেই আটপৌরে জীবনের গায়ে গায়ে লেগে থাকতে হবে এমন দাবি আমার অন্তত নেই। কিন্তু নিত্যজীবন, মানুষের (আমরা ধরে নিই না কেন— গান যিনি লিখেছেন তাঁরই) সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বোধ (তা সে এক মুহূর্তেরই হোক না হয়), অভাব-অভিযোগ, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তা, আশঙ্কা, কামনা, পছন্দ-অপছন্দ, ভালবাসা, ঘৃণা, সাফল্য-ব্যর্থতার কোনও স্বাক্ষরই যদি গানে না থাকে, গান যদি কেবল তুমি-আমি-তুমি-আমি করে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয় তাহলে যে বড় একমাত্রিক, একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায় ব্যাপারটা। এ প্রসঙ্গে গুটিকয়েক ব্যতিক্রমের কথা বলে দায় এড়ানো যাবে না। ছ-এর দশকের শেষ দিক থেকে সাতের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যেভাবে কলকাতায় বেঁচেছিলাম (১৯৭৫ সালের মে মাসে আমি বাধ্য হয়ে বিদেশে চলে যাই), যা যা দেখছিলাম শুনছিলাম পড়ছিলাম জানছিলাম বুঝছিলাম ভাবছিলাম, সেই নিত্য-অভিজ্ঞতার নিরিখে মনে হয়েছিল 'এ কোন সকাল রাতের চেয়ে অন্ধকার' ও 'এ কেমন রাত পোহাল দিন যদি আর এল না' অকৃত্রিমভাবে ওই যুগমুহূর্তের গান। শুধু কথার জন্য নয়। সুরতাল-লয় আর কথা-সুর মেলানো আঙ্গিকের জন্যেও সমান মাত্রায়। ওই কথাগুলিই অন্য কোনও সুরেতালে শুনলে আমার মনে অন্তত ওই ধাক্কাটা লাগত না।

সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের মতো জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের স্বরচিত গানের গ্রামোফোন রেকর্ডও (তাঁর প্রথম রেকর্ডটি ছিল সলিল চৌধুরির কথায়-সুরে) বেতারে বাজত। অনেকে তাঁর ভক্তও ছিলেন। কিন্তু অকিঞ্চিৎকর একঘেয়ে সাজানো-সাজানো বহু ব্যবহৃত কথা ও রূপকল্পের পৌনঃপুনিকতা এবং আরও কিছু কারণে আধুনিক বাংলা গান সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের অনেক শ্রোতার মনে পাঁচের দশকের সেই উৎসাহটা আর না থাকার কারণেই হয়ত আমার মধ্যে জটিলেশ্বরের কিছু গান যা ঘটাচ্ছিল তা আশপাশের অনেকের মধ্যেই ঘটাতে পারছিল না। তা ছাড়া, আধুনিক বাংলা গানের কাছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মধ্যশ্রেণীর মনে বিশেষ কোনও প্রত্যাশাও আর ছিল না বোধহয়। এ ছাড়াও ভেবে দেখা দরকার আধুনিক বাংলা গান বা সেইভাবে বলতে গেলে সঙ্গীতকে কি বাংলার নগরবাসীরা কোনওদিনই বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধার অভিব্যক্তি হিসেবে দেখেছে? দেখতে চেয়েছে? আধুনিক বাংলা কবিতার চেয়ে আধুনিক বাংলা গান নিঃসন্দেহে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছে, পৌঁছে থাকে। সারা পৃথিবীতেই সঙ্গীত, বিশেষ করে পল্লীসঙ্গীত বা লোকসঙ্গীত এবং লঘুসঙ্গীত (আধুনিক গান, 'পপমিউজিক') মুদ্রিত সাহিত্য, কবিতার চেয়ে ঢের বেশি মানুষের

মনে পৌঁছে গিয়েছে এবং যাচ্ছে। কিন্তু, পাশ্চাত্যের কথা বাদ দিলে, আমাদের দেশে, বাংলাভাষাভাষী বিরাট অঞ্চলে আধুনিক কবিতা আর আধুনিক গানকে মানুষ একই চোখে-কানে-দেখে-শোনে কি? সঙ্গীতের সঙ্গে যে মানুষের মেধা, সৃজনশীলতা ও দর্শনের অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে আমরা কি তা আদৌ বুঝতে ও মেনে নিতে শিখেছি? ওস্তাদ আমীর খান, ওস্তাদ বিসমিল্লা খান, পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ বিলায়েত খান বা সঙ্গীতাচার্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে কি কেউ এ দেশে 'ইন্টেলেকচুয়াল' বলে স্বীকার করবেন? বিষ্ণু দে-র কবিতা পড়ে তাঁকে নিঃসন্দেহে ভাবুক 'ইন্টেলেকচুয়াল' বলে মেনে নেবেন যে কোনও বাঙালি। কিন্তু সুকান্ত ভট্টাচার্যর রানার বা সত্যেন দত্তর পাল্কির গান সুর দিতে গিয়ে সলিল চৌধুরিকে যে মেধা প্রয়োগ করতে হয়েছিল তার পর আমরা কি তাঁকে এক ইন্টেলেকচুয়াল স্রষ্টা বলেছি? আজও বলছি কি? কোনওদিন বলে উঠতে পারব কি?

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গানের পৃথক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও, তাঁর যথেষ্ট গুণগ্রাহী থাকা সত্ত্বেও ছ'এর দশকে এবং সাতের গোড়াতেও গায়ক হিসেবে জনপ্রিয়তার সেই মাত্রাটি তিনি বোধহয় পাননি যা পিন্টু ভট্টাচার্য পেয়েছিলেন। তেমনি, ছয়ের দশকের শেষ দিকে আর এক প্রশিক্ষিত গায়ক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তাঁর বেতার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে ওঠেন। সুদাম ও জটিলেশ্বররের মতোই স্বকীয় গায়কীর অধিকারী ছিলেন তিনি। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কথায়-সুরে তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ড 'যে গানখানি শুনিয়ে যাই তোমায় বারেবার' ও 'যে আকাশে ঝরে বাদল/ সে আকাশে চাঁদ উঠবে কি' (এই গানটি দীর্ঘকাল আগে কৃষ্ণচন্দ্র দে রেকর্ড করেছিলেন বলে শুনেছি) অনেক শ্রোতার মনেই এই কণ্ঠশিল্পী সম্পর্কে উৎসাহ জাগাতে পেরেছিল। কিন্তু সার্বিক জনপ্রিয়তার হিসেবে পিন্টু ভট্টাচার্যর সমকক্ষ তিনিও বোধহয় হতে পারেননি। অবশ্য সুরকার হিসেবেও দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় দাগ কেটেছিলেন বাংলা গানের ইন্ডাস্ট্রিতে, যদিও বেশি কাজ তিনি করেননি।

'বেসিক রেকর্ডের' নানান গান, যেমন 'চল না দীঘার সৈকত ছেড়ে', 'সেই প্রথম সেই তো শেষ', 'জানি পৃথিবী আমায় যাবে ভুলে', এবং বেতার অনুষ্ঠানের জন্য ছ'এর শেষ ও সাতের দশকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন পিন্টু ভট্টাচার্য। কণ্ঠস্বর ও গায়কীর দিক দিয়ে সুদাম, জটিলেশ্বর, দীপঙ্করের মতো তাঁরও ছিল স্বকীয় একটি অবস্থান। মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবত পিন্টু ভট্টাচার্যর নরম, অনুচ্চ কণ্ঠের রোমান্টিকতার ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। জলসায় তাঁকে বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে গাইতে হয়নি বাজার ধরে রাখার জন্য।

ছয়ের দশকের পুরুষ-শিল্পীদের মধ্যে অনুপ ঘোষালও রীতিমতো খ্যাতি অর্জন করেন, তবে আধুনিক গানের 'বেসিক রেকর্ডের' জন্য নয়, সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসেবে। কণ্ঠসঙ্গীতে দস্তুরমতো

তালিম পাওয়া, সুদক্ষ গায়ক অনুপ ঘোষাল বেতারে আধুনিক গান ও নজরুলগীতি গেয়ে অনেক বেতার-শ্রোতার মনে নাড়া দিলেও 'গুগাবাবা'য় গুপীর গানগুলি গাওয়ার আগে তিনি বাংলার বৃহত্তর শ্রোতাসমাজে আলাদা কোনও জায়গা করে নিতে পারেননি। সত্যজিৎ রায়ের ছবিটি বেরনোর পর অনুপ ঘোষালের নাম হল। তারপর একাধিক ছায়াছবিতে প্লে-ব্যাক করেন তিনি, কিন্তু সে জন্য বাঙালি তাঁকে কতটা মনে রেখেছে, সন্দেহ। অনুপ 'বেসিক রেকর্ড'ও করেছিলেন। আকাশবাণীর নানান অনুষ্ঠানে সেগুলি বাজতও। কিন্তু সত্যি বলতে, পিন্টু ভট্টাচার্যর বেসিক রেকর্ডের গানগুলি শ্রোতাসাধারণের মনে জনপ্রিয়তার যে মাত্রা পেয়েছিল, অনুপ ঘোষালের 'বেসিক' গানগুলি তা পায়নি। ওই সময়, অনুপ ঘোষাল জীবনানন্দ দাসের 'হায় চিল' কবিতাটিতে সুরারোপ করে গেয়েছিলেন। নিরীক্ষামূলক কাজ হিসেবে ঘটনাটি স্মরণযোগ্য। জীবনানন্দ দাশের কোনও কবিতায় সুর দিয়ে কোনও গ্রামোফোন রেকর্ড তার আগে কখনও বেরিয়েছিল বলে আমার জানা নেই। সেই সঙ্গে এটাও ভাবার মতো যে, বাংলা কবিতায় সুর-সংযোজন করে গ্রামোফোন রেকর্ডে তা পরিবেশন করার ঘটনা পাঁচের দশকের পর আর ঘটেনি। সুকান্ত ও সতোন দত্তর কবিতায় সলিল চৌধুরির দেওয়া সুর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গায়কিতে বাংলা গানের ইতিহাসে লাইটহাউস হয়ে ওঠার পর অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধীন দাশগুপ্তও বাংলা কবিতায় সুরারোপ করেন। অভিজিতের সুরে গেয়েছিলেন শ্যামল মিত্র, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অসামান্য দক্ষতায়। সুধীন দাশগুপ্তর সুরে প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'সাগর থেকে ফেরা' কবিতাটি গেয়ে রেকর্ড করেছিলেন স্বয়ং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, যাঁর গাওয়া রানার ও পাঙ্কির গান বাংলা গানের ইতিহাসে মাইলস্টোন। 'সাগর থেকে ফেরা'য় চমৎকার সুর দিয়ে (তিনিই পারতেন) সুধীন দাশগুপ্ত কবিতাটিকে একটি স্মরণযোগ্য গানে রূপান্তরিত করেন। অথচ রানার ও পাঙ্কির গানের মতো এই গান দখল করতে পারেনি বাঙালি শ্রোতার মন। বাংলাদেশে তবু বাংলা গানের বিবর্তনমূলক এক সঙ্কলনে 'সাগর থেকে ফেরা' স্থান পেয়েছিল বলে জানি। বাংলাদেশের নট্যব্যক্তিত্ব আলি জাকের আমায় জানিয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই গানটি বিস্মৃত বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। বিনোদনের দুনিয়াটা যে কখন কোন নিয়মে চলে, শ্রোতারা যে কোন জিনিসটি কোন মুহূর্তে কীভাবে নেন, তার কোনও হিসেবই কষা যায় না। যাই হোক, অনুপ ঘোষাল জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সুর দিয়ে রেকর্ড করার বেশ কয়েক বছর পর বাংলা গানে একটা নতুন স্বাদ পাওয়া গেল। কবিতায় সুর দিতে গিয়ে (বিশেষ করে এমন একটি কবিতায়) অনুপ ঘোষাল কিন্তু বাংলা আধুনিক গানের কিসিমের বাইরে যাননি। কবিতার মেজাজ যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেই তিনি সুর করেছিলেন, গানটি পরিবেশন করেছিলেন। আজকের সুরকাররা যদি গানটি শুনে দেখেন, ভেবে দেখেন সুর-সংযোজনার আঙ্গিকটি, হয়ত লাভবান হবেন।

মহিলা-শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা ছয়ের দশকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন, তাঁদের

অন্যতমা আরতি মুখোপাধ্যায়। বাংলা ছবির নতুন প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসেবে তিনি বিপুল সমাদর পান। বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গে প্লে-ব্যাক গায়িকা হিসেবে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের পর আর কেউই অত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। শুধু জনপ্রিয়তা নয়, সুরে অব্যর্থ স্বরপ্রক্ষেপ, স্বাভাবিক শিষ্ট উচ্চারণ, বিভিন্ন ধরনের গানের আঙ্গিকে চমৎকার দখল, সাবলীল গায়কী এবং কাঙ্খিত আবেগ সংযতভাবে ফুটিয়ে তোলায় আরতি মুখোপাধ্যায় যে উৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন, বাংলা গানে তা অবিস্মরণীয়। আধুনিক সুরের ইডিয়মের পাশাপাশি আরতি মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতাচার্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের লেখায়-সুরে রম্যগীতিতে এবং বিশ্বের এক বিরাট সারেঙ্গি-শিরোমণি ওস্তাদ সাগিরুদ্দিনের সুরে ঠুংরিভাঙা যে গানগুলি গ্রামোফোন রেকর্ডে গেয়েছিলেন, সেগুলির আবেদন কখনও নিষ্প্রভ হওয়ার কথা নয়। পশ্চিমবঙ্গে, অন্তত অধিকাংশ সঙ্গীত-শ্রোতা ও সঙ্গীত সমালোচকের বিচার বিবেচনাস্পৃহা ও রসবোধ যে কোন মাপের তা বোঝা যায় কোথাও কোনও আলোচনায় আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া এই গানগুলির বিন্দুমাত্র উল্লেখ না দেখে। আজকের নবীন প্রজন্ম জানতেও পারলেন না, কোন মাপের এক শিল্পী এ-দেশে ছয় ও সাতের দশকে গান গেয়ে গিয়েছেন। বলা বাহুল্য, ছায়াছবির 'হিট' গান এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠা 'বেসিক রেকর্ড'ও তাঁর এত ছিল যে, অনুষ্ঠানে তাঁকে হিন্দি গান গাইতে হত না।

মহিলা-শিল্পীদের মধ্যে ছয়ের দশকের আর এক আবিষ্কার শিপ্রা বসু। দারুণ তৈরি কণ্ঠ, উঁচু দরের প্রতিভা। বেতারশিল্পী হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেও, বাস্তবিক পক্ষে তাঁর যোগ্য সমাদর তিনি পাননি। মনে রাখা দরকার, আধুনিক বাংলা গানের উজ্জ্বল শিল্পী বলতে আমরা আজও যাঁদের মনে রেখেছি, আরতি মুখোপাধ্যায় বাদে তাঁরা সকলেই পাঁচের দশকের শিল্পী। শিপ্রা বসুর মতো বড় মাপের দক্ষতার অধিকারীও যে উপযুক্ত স্থান পেলেন না, ছয়ের দশক থেকে বাংলা গানের জগতে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলিই তার জন্য দায়ী।

ছয়ের দশকের শেষদিকে পশ্চিমবঙ্গের মহিলা-কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে প্রধান সংযোজন সম্ভবত হৈমন্তী শুক্লা। খেয়াল থেকে শুরু করে আধুনিক গান পর্যন্ত নানান আঙ্গিকে তিনি উল্লেখযোগ্যরকম কুশলী। পুরোপুরি তালিমপ্রাপ্ত ও তেজি অথচ ভারী শ্রুতিসুখকর কণ্ঠের অধিকারী এই শিল্পীও বাংলা গানের আসরে তাঁর জনপ্রিয় আধুনিক গানের পাশাপাশি নজরুলগীতি ও রাগপ্রধান গান গেয়েছেন, হিন্দি ছবির গান নয়। কিন্তু খাঁটি সত্যি হল এই যে, সাতের দশক থেকে হিন্দি গানের দাপটে বাংলা গানের জনপ্রিয়তা লক্ষণীয় মাত্রায় কমে গিয়েছিল।

৬

দোষটা কি তাহলে হিন্দি গানের? হিন্দি গান বলতে পাঁচের দশক থেকে সারা উপমহাদেশের মানুষই সম্ভবত হিন্দি ছায়াছবির গান বুঝেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সঙ্গীতশিক্ষার্থীরা পাঁচের দশকের আগে থেকে অন্যান্য গানের সঙ্গে হিন্দি ভজনও শিখতেন। খেয়ালশিক্ষার্থীরা তো হিন্দি বন্দিশের সঙ্গে পরিচিত হতেনই। তিন ও চারের দশকে বাংলার একাধিক বরেণ্য শিল্পী যেমন, পঙ্কজকুমার মল্লিক হিন্দি গান গেয়ে গোটা উপমহাদেশে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গানে হিন্দি ভাষার সঙ্গে কোনও বিরোধ বাঙালির কোনও দিনই ছিল না।

পাঁচ ও ছয়ের দশকে হিন্দি চলচ্চিত্র যেমনই হোক, সেই চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গীতকাররা যে অসামান্য সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন ক্ষমতা ও সঙ্গীতবোধের অধিকারী ছিলেন তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই। নৌশাদ, রওশন, মদনমোহন, শচীন দেববর্মন, ও পি নাইয়ার, খৈয়াম, জয়দেব, সলিল চৌধুরি, শঙ্কর-জয়কিষণ— নামগুলিই তো যথেষ্ট। সুর ও চলনের দিক দিয়ে ওই দুই দশকে এত ভাল ভাল হিন্দি গান হিন্দি ছায়াছবিতে শোনা গিয়েছিল, যে সুররসিক মানুষের কাছে সেগুলি আদরণীয় না হয়ে ওঠার কোনও কারণ ছিল না। তেমনি, ১৯৮৪ সালে এক সাক্ষাৎকারে সলিল চৌধুরি আমায় বলেছিলেন, হিন্দি চলচ্চিত্রশিল্পে গান লেখার কাজে পাঁচের দশক থেকেই হিন্দুস্থানি ও হিন্দি কবিদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। ফলে হিন্দি ছবির গানের লিরিকে কাব্যগুণ সেই সময়ের আধুনিক বাংলা গানের তুলনায় ছিল বেশি। অন্যদিকে, হিন্দি ছায়াছবির বেশিরভাগ প্লে-ব্যাক শিল্পী ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ, বহুমুখী গায়নক্ষমতার অধিকারী। মুম্বইয়ের চলচ্চিত্র শিল্পে তখন থেকেই দারুণ সব দক্ষ যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেরা যন্ত্রীরা মুম্বইয়ে চলে যেতেন, সেখানে বসত নিতেন এবং সেখানকার স্টুডিওগুলিতে কাজ করতেন। হিন্দি ছবির প্রযোজনায় বাংলার চেয়ে অনেক বেশি টাকা খাটত, ফলে সঙ্গীত-প্রযোজনাতেও এখানকার তুলনায় বেশি টাকা নিয়োগ করা হত। এই সমস্ত কারণে হিন্দি ছবির যে সব গান সে-যুগে রেকর্ড হত, সেগুলি সাধারণ শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট। দর্শক-শ্রোতাসাধারণের (আমাদের দেশের কোটি কোটি অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত মানুষই বরাবর জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের প্রধান পেট্রন) মন জয় করার ক্ষমতা যে বাংলা ছবির চেয়ে ঢের বেশি নাচগানজেল্লা-ভরপুর হিন্দি ছবির ক্রমশই বেড়ে

উঠছিল তা ছয়ের দশকেই হয়ে উঠেছিল দিবালোকের মতো স্পষ্ট। জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনরুচির ক্ষয়ও ঘটছিল ক্রমান্বয়ে। বিনোদন বলতে সাধারণ মানুষ, এমনকি বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশও ক্রমশই মেনে নিচ্ছিলেন চটুল গান-বাজনা, কথায় কথায় অঙ্গভঙ্গিসহকারে নাচ, মার্কামারা কিছু একই ধাঁচের গল্প, চরম ভাবালুতা ও সেই সঙ্গে পেশিশক্তি প্রদর্শন, আজগুবি সব ঘটনা এবং কল্পিত বৈভবের চটক, যা নিদারুণ অর্থনৈতিক বৈষম্যপীড়িত এই দেশে দরিদ্রদের কাছে রূপকথার বর্ণালী বয়ে আনে।

গান বিচ্ছিন্ন কোনও বস্তু নয়। সমাজের আর পাঁচটা জিনিস, মানুষের বাস্তব জীবন, তার নানান সমস্যা, সুখদুঃখ, পাওয়া ও না-পাওয়া, সমাজের সার্বিক অবস্থা, ব্যক্তির অবস্থান, নানান মতবাদ, শ্রেণীগত অবস্থান, উৎপাদন ব্যবস্থা, বিপণন ব্যবস্থা, সাধারণভাবে বাণিজ্য ও অর্থনীতির দশা— সব কিছুর সঙ্গেই গান ও তার বাণিজ্যের সম্পর্ক। পাঁচের দশকের পর ছয়ের দশকে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে একাধিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একদিকে, কংগ্রেস দলের একাধিপত্য হল বামপন্থীদের দিক দিয়ে প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বামপন্থী রাজনীতি ও মতবাদ এই রাজ্যে পাঁচের দশক থেকেই জোরালো ছিল। ছয়ের দশকে তা আরও জোরালো এবং ঘাতপ্রতিঘাতময় হয়ে উঠল। চীন-ভারত যুদ্ধের পর কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে গেল। তেমনি বিধানসভার ভোটে কংগ্রেস হল যুক্তফ্রন্টের কাছে পরাজিত। উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়ায় কৃষক অভ্যুত্থানের সূত্রে নতুন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি জন্ম নিল। নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান প্রবল নাড়া দিল এ রাজ্যের বেশ কিছু রাজনীতি সচেতন মানুষ ও যুবসমাজের একাংশকে। রাজ্যে সাধারণভাবে বামপন্থীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ট্রেড ইউনিয়নগুলির জোরালো রাজনৈতিক উচ্চারণ, ধর্মঘট, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলন, বিভিন্ন মার্কসবাদী দলের মধ্যে মতবাদগত বিরোধ ও সঙ্ঘর্ষ, যুবশক্তির আবেগময় উৎসার ইত্যাদি কারণে ভারতের শ্রেষ্ঠী সমাজের দৃষ্টিতে কলকাতা তার বাণিজ্য-আকর্ষণ হারাতে থাকল। ছয়ের দশকেই, যেমন, ভারতের কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রীর উদ্যোগে একাধিক বিদেশি বিমানসংস্থা কলকাতা থেকে তাদের সার্ভিস তুলে নেয়। তার আগে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বিমান-মাধ্যমে কলকাতার নিয়মিত যোগ ছিল। কলকাতা বন্দরের প্রতিও ভারত সরকার বৈরী মনোভাব গ্রহণ করল। রাজনৈতিক রেষারেষি, সঙ্ঘর্ষ, সশস্ত্র আন্দোলন, পুলিসি দমন-উদ্যোগ ও পীড়ন, নাগরিক জীবনে প্রাত্যহিক অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা ইত্যাদির সমাহারে কলকাতার নিত্যজীবন ছয়ের দশকে অনেকটাই পাল্টে গিয়েছিল। চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির মতো বাংলা গানের ইন্ডাস্ট্রিকেও তখন বাঁচাতে হচ্ছিল সেই অবস্থার মধ্যে। সমাজে, চারদিকে যে এত কিছু ঘটে যাচ্ছিল, বাংলা চলচ্চিত্রে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও তার প্রতিফলন ঘটেছিল। সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী', মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' সেই যুগমুহূর্তের দলিল হয়ে

উঠেছিল। বাংলার আধুনিক গানে কিন্তু তার কোনও প্রতিফলন ঘটছিল না। আধুনিক বাংলা গান তার চিরাচরিত ভাবালুতাপূর্ণ প্রেম, সেই প্রেমের একঘেয়ে অভিব্যক্তি, প্লাস্টিকের ফুল দিয়ে ঘর সাজানোর মতো সাজানো দুঃখ, একই রকম কথা, বহুব্যবহারে জীর্ণ রূপকল্প আর মিষ্টি মিষ্টি সুর নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিল তার বালিতে মুখ গোঁজা উটপাখির সংসার।

অন্যদিকে, হিন্দি ছবির গানের জয়যাত্রার বিপরীতে বাংলা আধুনিক গানের আবেদন ক্রমাগত কমে যাচ্ছে— এটা বুঝতে পেরে গ্রামাফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া বাংলার ভাল ভাল শিল্পীদের দিয়ে জনপ্রিয় হিন্দি গানের সুরে বাংলা গান গাওয়ানো শুরু করল। ব্যবসার দিক দিয়ে কিন্তু সে উদ্যোগ কোম্পানিকে কোনও সাফল্যই এনে দিল না। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীদের দিয়ে রেকর্ড করানো ওই সব গান কোনও শ্রোতা মনে রাখতে পেরেছিলেন বা মনে রাখতে চেয়েছিলেন বলেও মনে হয় না। ছয়ের দশকের গোড়ায় 'লিমবোরক' নামে একটি বিদেশি যন্ত্রসঙ্গীতের সুর কলকাতায় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই সুরে ইলা বসুকে দিয়ে রেকর্ড করানো হল: 'যদি না ভালবাসিতাম/ এ মালা গেঁথে আনিতাম/ তবে আর তুমি না এলে/জীবনে ক্ষতি ছিল কী'— বেচারি ইলা বসু (এক দক্ষ কণ্ঠশিল্পী), বেচারা বাংলা গান, বেচারা বাঙালি! গানের প্রযোজক, গীতিকার কারোর মাথাতেই আসেনি যে ছোট ছোট সুরের টুকরোয়, সে-যুগে আবিশ্ব-জনপ্রিয় 'টুইস্ট' নাচের তালে বাঁধা, নাগরিক 'স্মার্টনেস'-এ মোড়া 'লিমবোরক'-এর স্ফূর্তির সঙ্গে 'ভালবাসিতাম', 'আনিতাম' গোছের শব্দ ও তাদের অনুষঙ্গ হাস্যকররকম বেমানান। ছয়ের দশকের শেষের দিক থেকেই বাংলা আধুনিক গানের এই ছিল প্রবণতা। ভাল সুর যে একটাও হচ্ছিল না তা নয়। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল ততই আরও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা গানের গীতিকার, সুরকার, শিল্পী ও প্রযোজকরা স্নায়ুতাড়িত। দিশাহারা তাঁরা। তাঁদের একের পর এক কাজে সমানে ধরা দিচ্ছে সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। আধুনিক কথাটির একটি বড় শর্ত হল যুগোপযোগিতা। সেই বস্তুটি আধুনিক বাংলা গানে কোনওদিনই ঠিক ছিল কি? সুর, গায়কি, যন্ত্রসঙ্গীতের প্রয়োগ হয়ে উঠছিল যুগোপযোগী। কিন্তু লিরিক? গানের সার্বিক আবেদন? এ কথা সত্যি যে মানুষ গান শোনে মূলত সুর তাল ছন্দের কারণে। কিন্তু তাই বলে 'কথা'কে সে কি কোনও গুরুত্বই দেয় না? তা যদি না দিত তাহলে বাংলার পল্লীগীতিতে 'কথা'র মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে এত বিচিত্র ভাবনা, অনুভব, আবেগ ও বর্ণনা প্রকাশিত হল কী করে? মানুষ তো তাহলে একই ধরনের কথায় বিভিন্ন ধরনের সুর লাগিয়ে লাগিয়ে চালিয়ে দিতে পারত! বাংলার পল্লীগীতিতে সুর তাল ছন্দ কাঠামো গায়কি ও বাদনরীতির (সব ধরনের গানে একই ধরনের যন্ত্রাণুষঙ্গ কোনদিনই থাকেনি) বিপুল বৈচিত্র্যের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে 'কথা'র, লিরিকের বৈচিত্র্য। তাতে নানান ঋতু, সামাজিক পালাপার্বণ, অনুষ্ঠান,

জীবনদর্শন, দেবদেবীর পুজো, আল্লাহ্‌পাক ও রসুলকে ঘিরে আবেগ, 'সেকিউলার রোমান্স', কাজ, অভাব-অভিযোগ, নিঃসঙ্গতা, প্রেম, বিরহ, জীবনস্ফূর্তি, নাচ, হাস্যরস, 'হিউমর' কিছুই বাদ পড়েনি। এই বিচিত্র বিষয়সমৃদ্ধ গানও তো বাংলার ঘরোয়া ও সামাজিক সম্পদ। সে তুলনায় বাংলার আধুনিক গানে? সময়ের বহমানতায় সমাজের নানান স্তরে পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, বদল আসছে ব্যক্তিজীবনে, দৃষ্টিভঙ্গিতে, বোধে, অনুভবে, আবেগে, ভাষার প্রকাশভঙ্গিতে, দর্শনে। কিছুই আর সেই আগের অবস্থায় থেমে থাকতে চাইছে না। বাংলার গ্রুপ থিয়েটারের নাটক, বাংলা কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, পত্রিকার নিবন্ধ, নতুন ধারার কাহিনীচিত্র ও তথ্যচিত্রে পাঁচের দশক থেকে কত দিকবদল ঘটে গেল। আগেকার কত উপাদান ও বয়ান বর্জন করল মানুষ। তৈরি করে নিল নতুন প্রকাশভঙ্গি যা তার ক্রমাগত পাল্টে যাওয়া জীবন ও বোধের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে পারে। বাংলা গানের নির্মাতা ও শিল্পীরা কিন্তু তাঁদের কাজ ও উচ্চারণে সেদিকে নজরই দিলেন না। সমকালীনতার কোনও সাক্ষ্যই রাখলেন না তাঁরা গানের কথা-সুর-তালছন্দের মিলিত অভিব্যক্তিতে। গানকে করে তুললেন না সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন ও ব্যক্তিজীবনের জঙ্গমে সামিল। বছরের পর বছর শুধু কিছু আপ্তবাক্য আর অপরিবর্তনীয় উপাদানের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে গেলেন। কেউ বলতে পারেন, 'আহা, গান বা সঙ্গীতের কাছে আমি যাই প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখকষ্ট আর চাপ ভুলতে। গান যেন আমার স্নায়ুর চাপ কমাতে সাহায্য করে, গান যেন আমার বাস্তব জীবনটা অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভুলিয়ে দিতে পারে।'— এ দাবি অন্যায় নয়। সঙ্গীতের একটি কাজ অবশ্যই মানুষের এই দাবি পূরণ। কিন্তু সেটি একটি কাজ, একটি দিক মাত্র। এটা সঙ্গীতের একমাত্র, এমনকি প্রধান কাজও নয়। সাহিত্য, পেন্টিং, নাটক, চলচ্চিত্র ও নাচের মতো সঙ্গীতের কাজ অভিব্যক্তি। সঙ্গীতকারের নানান আবেগ, ভাবনা ও বক্তব্য সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠবে এটাই সভ্যতার দাবি। পৃথিবীর বড় বড় সঙ্গীতকার এটাই করে গেছেন। আমাদের দেশের ঐতিহ্যময় রসশাস্ত্রেও নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যে যে নানান রসের প্রকাশের কথা বলা আছে (যার মধ্যে আদিরস বা করুণ রসই শুধু নয়, বীররস এমনকি বীভৎস রসের কথাও রয়েছে) তা খামখেয়ালবশত নয়। কণ্ঠসঙ্গীতে (ধ্রুপদ-খেয়াল) ও তারযন্ত্র বাদনে যে গমকের প্রয়োগ, তার উদ্দেশ্য কারুণ্য বা প্রেমাবেগের হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার ভাব জাগানো আদৌ নয়।

গান বা সঙ্গীত মাঝে মাঝে স্ফূর্তির তারল্যে ভাসিয়ে দিক মানুষকে, ভুলিয়ে দিক সাময়িকভাবে তার অস্তিত্বের গুরুভার, অস্বস্তিতে দিক স্বস্তি, এমনকি ঘুম পাড়াক— এ দাবি অবশ্যই স্বাভাবিক। দুনিয়ার প্রতিটি সমাজ ঘুমপাড়ানি গান তৈরি করেছে, করেছে বিশুদ্ধ অবসরযাপন ও স্ফূর্তি করার সঙ্গীত। কিন্তু কেবল ওই কাজগুলিই সঙ্গীতের একমাত্র কাজ হোক— এমন দাবি অস্বাভাবিক, সঙ্গীতবিরোধী, সভ্যতাবিরোধী, মানুষের স্বভাববিরোধী। জার্মান সঙ্গীতস্রষ্টা ও

দার্শনিক হান্‌স্‌ ভেরনার হেনৎসে তাঁর 'সঙ্গীত ও রাজনীতি' গ্রন্থে লিখেছেন: 'সঙ্গীত দাসও তৈরি করতে পারে।' বাংলার আধুনিক গানের ক্ষেত্রে কথাটি ভেবে দেখা দরকার। ভাবা দরকার আমাদের সামগ্রিক সঙ্গীতচিন্তা ও বিনোদনচিন্তা সম্পর্কেও। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে, বাংলাদেশে, বস্তুত সারা উপমহাদেশে সঙ্গীত-ইন্ডাস্ট্রি যা করে চলেছে, এমনকি যৌবনের সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তির নামেও যা হয়ে চলেছে, তা দাস বানানোর এক বিপুল উদ্যোগ ছাড়া অন্য কিছু কি?

৭

একাত্তর সালে একটি ঘটনা ঘটল যা বাঙালির এক হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালি জাতির জীবনে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ঘটনা। পৃথিবীর প্রথম বাঙালি রাষ্ট্র জন্ম নিল। বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক বাংলা গানের জগৎ যে তখন কোন হাঁড়ির হালে পর্যবসিত, তার প্রমাণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে একটি মাত্র আধুনিক বাংলা গান রচিত, পরিবেশিত ও রেকর্ডবদ্ধ হল: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা, অংশুমান রায়ের সুর করা ও গাওয়া। ডিস্কের অপর পিঠে এককালের বিখ্যাত গিটারশিল্পী সুজিত নাথের কন্যা করবী নাথ ওই গানটিরই ইংরেজি সংস্করণ গাইলেন। অংশুমান রায়ের গানটি সে মুহূর্তে যে বিপুল সমাদর পেয়েছিল, তা প্রায় নজিরবিহীন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যুগোপযোগী, যুগমুহূর্তের দাবি মেটানোর যোগ্য একটি বাংলা গান পাওয়া গেলে বাংলার সাধারণ মানুষ তা লুফে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। পশ্চিমবাংলার দিকে দিকে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বিভিন্ন পার্বণে, অনুষ্ঠানে তখন এই গানটির রেকর্ড লাউডস্পিকারে বাজত। গানটির ধুয়ো 'বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ' বেশ কিছুদিন ধরে বাংলার জনমানস দখল করে ছিল। ভীষণ চিন্তাশীল, সারাক্ষণ সব কিছুর চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে যাওয়ার ঠিকেদারি নেওয়া, সদা-সিনিকাল বঙ্গসন্তানরা ওই গানটি কোন কানে শুনছিলেন, আদৌ শুনছিলেন কিনা, ঠিক জানি না। আমি জানি সাধারণ মানুষদের কথা। তাঁরা সহজেই বরণ করে নিয়েছিলেন গানটি।

ওই সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া সলিল চৌধুরির চারটি পুরনো গানের সঙ্কলন বের করেছিল (৪৫ আর পি এম/এক্সটেন্ডেড প্লে রেকর্ড) 'বাংলা আমার বাংলা' নাম দিয়ে। নেপথ্যে কোরাস, অগ্রভূমিতে মান্না দে ও সবিতা চৌধুরি। দুজনের, বিশেষ করে মান্না দে-র গায়কিতে 'মানব না বন্ধনে' সেই যুগমুহূর্তে (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ তখন চলছে, চলছে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধও) এক জুৎসই উচ্চারণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু লক্ষ্য না করে উপায় নেই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, তিরিশ লক্ষ বাঙালির শাহাদাত বরণ, বাঙালি জাতির প্রথম সার্বভৌম উচ্চারণের মতো ঘটনাও সলিল চৌধুরির কাছ থেকেও একটি নতুন গান আদায় করতে পারেনি। তিনি শুধু 'মানব না বন্ধনে' গানটিতে (গানটি তার তিন দশক আগে তৈরি) একটি নতুন স্তবক জুড়ে দিয়েছিলেন মাত্র: 'মাগো বাংলা আর কতদিন/নিজভূমে পরবাসী প্রতিদিন/রব, পদেপদে গঙ্গাপদ্মা

হায়/রক্তনদী হয়ে বয়ে বয়ে যায়/মাগো তোর কোটি কোটি সন্তানে/নেয় প্রতিজ্ঞা আর সব না।' একই সময়ে শচীন দেববর্মন রেকর্ড করেন তাঁর অনেককাল আগে রেকর্ড-করা বিখ্যাত একটি গান 'শুনি তাক্ ডুম্ তাক্ ডুম্ বাজে, বাজে ভাঙা ঢোল' ভেঙে তৈরি একটি গান। 'ভাঙা ঢোল'-এর জায়গায় বসানো হল 'বাংলাদেশের ঢোল।' 'টাক ডুম্ টাক্ ডুম' বাদে আর সবই দেওয়া হল এখানে ওখানে পাল্টে। 'ভাঙা ঢোল'-এর ভাঙা গান। গোটা একটা নতুন গান কিন্তু পাওয়া গেল না।

পশ্চিমবঙ্গের বাংলা গানের ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমরা ওই রকম এক যুগমুহূর্তেও পেয়েছিলাম তাহলে অংশুমান রায়ের কণ্ঠে-সুরে, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা একটিমাত্র গান, সলিল চৌধুরির পুরনো একটি গানের শেষে জুড়ে দেওয়া নতুন একটি স্তবক। এবং শচীন দেববর্মনের গাওয়া পুরনো গান ভাঙা একটি গান যেটিকে নতুন গান বলতে বাধে।

পশ্চিমবঙ্গে বাংলা গানের ইন্ডাস্ট্রির বাইরে বাংলায় নতুন গান রচনার বিচ্ছিন্ন কিছু উদ্যোগ সাতের দশকেই দেখা যায়। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই দশক ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে সামরিক-রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ কেঁপে ওঠে নকশালপন্থী রাজনৈতিক উচ্চারণে। সঙ্ঘর্ষের রাজনীতি ও প্রশাসনের কঠোর ও প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ ও দমননীতি ডেকে আনে নাগরিক জীবনে অদৃষ্টপূর্ব অনিশ্চয়তা। সাতের দশকেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন জরুরি অবস্থা। সেই ঝকমারির দশকেই শোনা যায় প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কিছু রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত বাংলা গান, যদিও সেগুলি তখন রেকর্ড করা হয়নি। রেকর্ড না থাকায় এবং বেতার বা অন্য কোনও গণমাধ্যমে এই গানগুলি শোনার সুযোগ না থাকায় এগুলি প্রচার পায়নি। নকশালপন্থী রাজনীতির সমর্থকরা অনেকেই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কোনও কোনও গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সে রকমেই এক একটিভিস্টের কাছে আমি ১৯৭৯ সালে কয়েকটি গান শুনি। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গানগুলি কিন্তু তখন গণসঙ্গীত নামেই পরিচিত ছিল। আমি নিজেও সাতের দশকের মাঝামাঝি গান তৈরি করতে শুরু করি। 'এ কেমন আকাশ দেখলে তুমি', 'ভাল লাগছে না অসহ্য এই দিনকাল', 'কে তৈরি করেছিল তাজমহল', শহীদ কাদরির কবিতার ধাক্কায় 'রাষ্ট্র' সাতের দশকেই তৈরি। এগুলিও তখন রেকর্ড করা হয়নি। 'নাগরিক' নামে একটি শিল্পীগোষ্ঠী, আমি যার সদস্য ছিলাম, ১৯৭৯ সালে গানগুলি গাইছিলেন, যদিও খুব কম মানুষই গানগুলি শোনার সুযোগ পেয়েছিলেন সে-সময়ে। একই সময়ে 'মহীনের ঘোড়াগুলি' নামে কলকাতার এক শিল্পীগোষ্ঠী কিছু নতুন গান তৈরি করেন। তাঁদের গানগুলির সুর ছিল ইংরেজি গান-ঘেঁষা এবং লিরিকে নগরজীবনের কিছু কথা স্থান পাচ্ছিল। গৌতম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এই গোষ্ঠীর একজন শিল্পী, সৃজনশীল মানুষ। এঁদের গানে এক ধরনের নতুনত্ব ধরা দিচ্ছিল, কিন্তু খুঁটিয়ে

শুনলে এও মনে হচ্ছিল যে এঁরা তখনও এঁদের গানের 'ভাষা' পুরোপুরি খুঁজে পাননি। তাছাড়া এক ধরনের নাগরিক ভাবালুতাও পাওয়া যাচ্ছিল এঁদের গানে। ধারাবাহিকভাবে গান রচনা ও পরিবেশন করে গেলে হয়ত লিরিকনির্মাণে, সুরসংযোজনায় ও গায়কীতে তাঁদের গান কালক্রমে আরও সুঠাম দেহ পেত। কিন্তু রচনার ধারাবাহিকতা তাঁরা রক্ষা করেননি। আটের দশকে ইন্দ্রজিত সেন, ইন্দ্রনীল সেন, প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম নাগ এবং আরও কয়েকজন 'নগর ফিলোমেল' নাম নিয়ে তৎকালীন গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া থেকে একটি নতুন গানের এলবাম বের করেন। ক্যাসেটের ওপর লেখা ছিল 'সহর সঙ্গীত'। অর্থাৎ এই শিল্পী দল ঘোষণা করেই নগরজীবনকেন্দ্রিক গান পরিবেশন করতে চাইছিলেন। এই এলবামে নগর ফিলোমেলের গাওয়া মহীনের ঘোড়াগুলির গানও ছিল, সেই সঙ্গে নতুন কিছু গান। গৌতম নাগের লেখা 'বিজনের চায়ের কেবিন' নিঃসন্দেহে নগর জীবনকেন্দ্রিক গান, যার কথা ও সুরের বিষন্নতা স্পর্শ করে। কিন্তু নগর ফিলোমেল বা গৌতম নাগ নতুন গান রচনা ও চর্চার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি। এ ব্যাপারে তাঁরা মহীনের ঘোড়াগুলির মতোই। পরবর্তীকালে নগর ফিলোমেলের ইন্দ্রনীল সেন বরং 'রিমেক' গান গেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন, যুগোপযোগী নতুন গান গেয়ে নয়।

গানের কথা-সুর-গায়কি-যন্ত্রাণুষঙ্গের কায়েমি প্রথার বাইরে গিয়ে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে নতুন গান তৈরি করা এবং শ্রোতাসমাজে তার জন্য জায়গা দখল করে নেওয়ার জন্য সৃষ্টি ও চর্চার ধারাবাহিকতা যে কতটা অপরিহার্য তা বুঝতে গেলে ইংরেজি দুনিয়ার 'সংরাইটারদের' দিকে একবার তাকানো দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ইংল্যান্ডে, লঘু সঙ্গীতের দুনিয়ার পাঁচ ও ছ-এর দশকে 'সংরাইটার'দের যুগ এসেছিল। তার আগে, পাশ্চাত্যে আধুনিক গানের যে ধারা ছিল, প্রেম ছিল যে গানের মূল উপজিব্য এবং যে গানের লেখক ও সুরকার ছিলেন সচরাচর আলাদা, 'সংরাইটাররা' তা থেকে বেরিয়ে গিয়ে গানের এক নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করে ফেললেন। এঁরা নিজেরা গান লিখতেন, সুর করতেন, গাইতেন। ফলে, নতুন নতুন গান তাঁদের যার যার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবনা'ও দর্শনের অভিব্যক্তি হয়ে উঠল। গান হয়ে উঠল 'স্টেটমেন্ট'। তার আগে গানের এই দার্শনিক ভূমিকাটা ছিল না। গানের ভূমিকা ছিল নিছক বিনোদন। কিন্তু 'সংরাইটারদের' যুগ শুরু হওয়ায় স্থানকালের পরিসরে গান নানান বিষয়ে ব্যক্তির চিন্তাধারা, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের প্রতিনিধি হয়ে উঠল। ছ'-এর দশকে আমেরিকায় ও ইংল্যান্ডে সংরাইটারদের প্রতাপ ও জনপ্রিয়তা এমন জায়গায় পৌঁছল যে সাধারণ 'পপ' গানের ছয়-পূর্ববর্তী আধিপত্য আর রইল না। ছ'-এর দশকে ছিল বীটলস গোষ্ঠীর আবিশ্ব জনপ্রিয়তা, অনুষ্ঠানে যা এক ধরনের গণ হিস্টিরিয়া ডেকে আনত। বীটলসরা নিজেরাই গান লিখতেন, সুর করতেন, গাইতেন, বাজাতেন। প্রথমদিকে বয়ঃসন্ধিসুলভ প্রেমের গান বাঁধলেও কালক্রমে

তাঁরা লিরিক ও সুরের দিক দিয়ে আরও সিরিয়াস গানও রচনা করেন। কিন্তু তা হলেও, দার্শনিক দিক দিয়ে তাঁদের গান সেই যুগের যুগচেতনার প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি যা সেই যুগেই, অর্থাৎ ছ'-এর দশকে বব ডিলানের গান হয়ে উঠতে পেরেছিল, বা তার কিছু পরে কানাডার সংরাইটার লেনার্ড কোহেনের গান। বীটলস গোষ্ঠীকে সংরাইটার বলা যাবে না। কারণ সংরাইটার একক ব্যক্তি। একজনের লেখা-সুর-করা-গাওয়া গানের ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে সময় ও ব্যক্তির মধ্যকার যে সম্পর্ক ফুটে ওঠে তা বীটলসদের গানে ফুটে ওঠেনি। এই বিবর্তন দেখা গিয়েছিল পীট সীগার, বব ডিলান, ফিল অক্স, জোন বায়েজের গানে। সাতের দশকে জার্মানিতেও 'লীডারমাখার'দের (যার আক্ষরিক অর্থ গান-গান-নির্মাতা) আবেদন আনল নতুন যুগ। আমরা অবশ্য জার্মানি বা ফ্রান্সের আধুনিক গান সম্বন্ধে খবর বিশেষ রাখি না, প্রধানত ভাষার কারণে। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমটি থাকায় আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের গানের জগতের সঙ্গেই আমাদের যোগ। লক্ষ্যণীয়, সাত ও আটের দশকেও শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, বাংলাদেশেও যে শিল্পীরা জনপ্রিয়া ইংরেজি গানের আঙ্গিক বরণ করে নিচ্ছিলেন, তাঁরা কিন্তু সংরাইটারদের সৃষ্টির চেয়ে ছ'-এর দশকের ইংরেজি 'পপ' আঙ্গিকটিকেই প্রাধান্য দিচ্ছিলেন বেশি। বীটলসদের গান ছিল গোত্রের দিক দিয়ে 'পপ' এবং পাশ্চাত্যের উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরাই ছিলেন তাঁদের প্রধান শ্রোতা। একটি পর্যায়ে লন্ডন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার মত সম্ভ্রান্ত ধ্রুপদী যন্ত্রীদল বীটলসদের গানের সঙ্গে অর্কেস্ট্রো রচনা করে ও বাজিয়ে গ্রামোফোন রেকর্ড করেছিলেন। লেনার্ড বার্নস্টাইনের মতো বিরাট সিম্ফনি-পরিচালক, পিয়ানিস্ট ও সঙ্গীতকারও বলেছিলেন— বীটলসদের কোন কোন গান সাঙ্গীতিকভাবে এত উন্নত যে সেগুলিকে স্বচ্ছন্দে শুবার্টের 'লীডার'-এর (জার্মান ভাষায় 'লীড' মানে গান, 'লীডার' বহুবচন: প্রখ্যাত ধ্রুপদী জার্মান সঙ্গীতকার শুবার্ট বিভিন্ন গানে সুরারোপ করে সেগুলিকে মার্গসঙ্গীতের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই গানগুলি তাঁর 'লীডার' নামেই পরিচিত) পাশে স্থান দেওয়া যায়। আমাদের দেশের 'মহান' সঙ্গীতজ্ঞরা যদি পাশ্চাত্যের ওই প্রবাদপ্রতীম সঙ্গীতকারের ঔদার্য থেকে একটু শিক্ষা নিতেন! যাই হোক, কোন কোন গানের উন্নত সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বীটলসদের গানে এমন কোনও দর্শন ধারাবাহিকভাবে ধরা দেয়নি যার দরুণ তাঁদের গানের প্রফেট বলা যেতে পারে। বব ডিলান বা লেনার্ড কোহেন, সংরাইটার হিসেবে, সেই জায়গাটি পেয়েছিলেন। সাতের দশক থেকে কলকাতায় বিচ্ছিন্নভাবে যাঁদের গোষ্ঠীবদ্ধ উদ্যোগে ইংরেজি গানের কিসিমঘেঁষা কিছু গান পাওয়া যাচ্ছিল তাঁদের কাজে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের 'সংরাইটারদের' গানের প্রভাব অতটা ধরা দিচ্ছিল না, যতটা মিলছিল পাশ্চাত্যের ছ'এর দশকোচিত 'পপ্' মিউজিকের অনুরণন। অর্থাৎ, সে-সময়ের স্থানকালের পরিসরে তাঁদের গানের দেহে ভাষা পাচ্ছিল না ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, মন্তব্য, দর্শন। বলা বাহুল্য, দর্শন বলতে আমি এ-ক্ষেত্রে কান্ট বা

হেগেলের দর্শন বোঝাতে চাইছি না। প্রতিটি গান একটি আলাদা সৃষ্টি। তার স্বল্প পরিসরেও বিভিন্ন বিষয়ে ও প্রসঙ্গে গান-নির্মাতার দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, চিন্তা উচ্চারিত হতে পারে। সেই উচ্চারণ কিন্তু লক্ষ্যণীয় মাত্রায় ছিল না। যেটুকু ছিল তা নিতান্ত বিক্ষিপ্তভাবে অপরিণত অবস্থায়।

ইংরেজি পপ গানের ধরণ ও আবেদন (আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রতি রবিবার দুপুরে প্রচারিত 'মিউজিকাল ব্যান্ডবক্স' অনুষ্ঠানটির দৌলতে পাঁচের দশক থেকে অসংখ্য ইংরেজি পপ গান শোনা গিয়েছে) বাংলা গানে সরাসরি সঞ্চারিত করে আধুনিক বাংলা গানের বাজারে নতুন কোনও বিক্রি-হুজুগ তোলা যায় কিনা, শ্রোতাদের মনে উৎসাহ আনা যায় কিনা সেই চেষ্টাও গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া করতে ছাড়েননি সাতের দশকের গোড়ায়। এই উদ্যোগপ্রসূত গানগুলির রেকর্ডে 'বাংলা পপ' তকমাও সাঁটা হয়েছিল। রাণু মুখোপাধ্যায় ও শ্রাবন্তী মজুমদারের কণ্ঠে সে সময় এই আঙ্গিকের কিছু গান শোনা গিয়েছিল। রানু মুখোপাধ্যায়ের একটি গান 'বুশি পল' কলকাতা কেন্দ্রের অনুরোধের আসরে বাজতও মাঝেমাঝে। 'কুচকুচে কালো সে যে জাতে স্প্যানিয়াল' এই ছিল গানটির শুরু। নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। গানটির সুরে ও গায়কিতে ছিল এককালের জনপ্রিয় মার্কিন পপশিল্পী কনি ফ্রান্সিসের গানের প্রভাব। স্মৃতিনির্ভর আমার এই লেখায় আমি কখনও কখনও অসহায়বোধ করছি কারণ কোন গানের কে সুরকার, কে গীতিকার তা আমার আর হুবহু মনে নেই। তবে যতদূর মনে পড়ে ভি বালসারা কয়েকটি গানের সুর দিয়েছিলেন, আর কয়েকটি গান লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। বাংলা পপ গোত্রের আর একটি গ্রামোফোন রেকর্ডে ছিল— 'মা আমায় বলেছে আমি নাকি বড় হয়েছি।' বাস্তবিকই ইংরেজি পপ আঙ্গিকে তৈরি ও গাওয়া এই গানটিও ব্যতিক্রমী আবেদন এনেছিল। গ্রামোফোন কোম্পানির এইসব বাংলা পপ্ গানের রেকর্ড শুনে তখন মনে হয়েছিল এগুলির উদ্দেশ্য নবীন শ্রোতাদের আকর্ষণ করা। কারণ, আধুনিক বাংলা গানের প্রচলিত ধারায় যাঁরা তখন অভ্যস্ত সেই উত্তীর্ন-কৈশোর ও মধ্যবয়সী শ্রোতাদের এই ধরনের গান শুনে খুব আকৃষ্ট হওয়ার কথা ছিল না। এই বাংলা পপ্ গানগুলি সে-যুগে বাংলার কিশোর-কিশোরীদের কেমন লেগেছিল তা জানার উপায় নেই, কারণ সঙ্গীত বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের রীতি আমাদের দেশে তখনও ছিল না, এখনও নেই। তবে 'বাংলা পপ্' মার্কা গ্রামোফোন রেকর্ড গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া কয়েকটির পর আর বিশেষ বের করেননি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে গানের বাজারে রেকর্ডগুলি তেমন চলেনি। চললে এই গোত্রের গানের রেকর্ড আরও বেরোত।

'বাংলা পপ্' তকমায় কিছু আধুনিক গানের গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশের এই উদ্যোগ থেকে বোঝা যায়: প্রচলিত বাংলা আধুনিক গানের ধরণধারন ও কথা-সুর-গায়কির বক্তব্যর বাইরে বেরনো যে দরকার, ইন্ডাস্ট্রির একটি অংশ তা

উপলব্ধি করেছিল। কারণ, ছ'-এর দশক শেষ হওয়ার আগে থেকেই আধুনিক বাংলা গানের ব্যবসায় মন্দা দেখা দিতে থাকে। শুধু তাই নয়, গান সমাজেরই অঙ্গ। বিচিত্র নাগরিক জীবনের সঙ্গে গান যদি একটি সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য রক্ষা না করতে পারে, নাগরিক জীবন ও ব্যক্তি-সমাজের সম্পর্কের বিচিত্র দিকগুলিকে এড়িয়ে গান যদি কেবল একই দিকে চলতে থাকে বছরের পর বছর তাহলে সেই গানের ধারা মজে যেতে বাধ্য। কথা-সুর-গায়কীর কাঠামোগত ও চরিত্রগত দ্বন্দ্বের কারণে আধুনিক বাংলা গান ছ'-এর দশক থেকেই স্রোতহীন নদীর মতো হয়ে পড়ছিল, মজে যাচ্ছিল।

সাতের দশকে, বাজারচলতি গানের ধারার বাইরে বাংলা গান বানানো ও গাওয়ার সীমিত ও বিচ্ছিন্ন কিছু চেষ্টা কলকাতার রঞ্জনপ্রসাদ (প্রসাদরঞ্জন) ও বহরমপুরের হর্ষ দাশগুপ্তও করেছিলেন। যতদূর জানি, পীট সীগারের গাওয়া 'লিটল বক্সেস' গানটির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন রঞ্জনপ্রসাদ। কিছু গান বেঁধেওছিলেন। শুনে মনে হয় এই গানগুলির প্রেরণায় ছিল ইংরেজি গানের ধারা। আধুনিক বাংলা গানের ধারায় ও ইডিয়মে এঁরা কেউ ধারাবাহিকভাবে গান বাঁধেননি। সামাজিকভাবে এই ধরনের গান সীমিত ছিল সংক্ষিপ্ত পরিসরে। গ্রামোফোন রেকর্ড বা বেতারের মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে এগুলি সামাজিকভাবে গতিশীল হয়ে ওঠেনি। এ প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মনে রাখা দরকার। গান শুধু বাঁধলেই হয় না। সেই গান দক্ষ কণ্ঠে গাওয়াটাও সমান জরুরি। অদক্ষ, পরিশীলনহীন কণ্ঠে ভাল গানও অনেক সময় শ্রোতাকে তুষ্ট করতে পারে না। যে কোনও ভাষায় নতুন গান বেঁধে গাওয়ার ব্যাপারে এই দিকটা মাথায় থাকা দরকার। ১৯৮৫ সালে 'নাগরিক' শিল্পীগোষ্ঠীর পরিবেশনায় আমার তৈরি গান গ্রামোফোন রেকর্ড করার ব্যাপারে গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়ার তৎকালীন কর্মকর্তা বিমান ঘোষ আমায় বলেছিলেন গানগুলির ঠিকমতো, পেশাদার দক্ষতায় গাওয়া না হলে কোনও সুফল পাওয়া যাবে না। তিনি আমায় মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, সলিল চৌধুরির গানগুলি পাঁচের দশক থেকে অত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছিল শুধু রচনার গুণে নয়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, লতা মুঙ্গেশকরের মত কণ্ঠশিল্পীদের গুণেও। তিনি এমনকি কণ্ঠশিল্পীদের গুণপনার বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল আকাশবাণীতে কাজ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং ভারতের বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুবাদে বিমান ঘোষ সেদিন যে মত দিয়েছিলেন তা খাঁটি। ভাল গান বা জরুরি গান শুধু রচনা করলেই হবে না, দক্ষতার সঙ্গে তা পরিবেশনও করতে হবে। দ্বিতীয় শর্তটি সম্ভবত প্রথমটির চেয়ে বেশি জরুরি। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, অনেক গান আমরা আজও শুনে যাই, বারবার শুনি কণ্ঠশিল্পীর আবেদনের কারণে। সেই গানগুলি হয়ত 'গান' হিসেবে দুর্বল। দক্ষ, পরিশীলিত পরিবেশনার গুণে সেই দুর্বল গানগুলিও শুনতে ভাল লাগে।

বাজারছুট নতুন বাংলা গান রচনা ও পরিবেশনার ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি নিশ্চই ছিল এবং আছে। সাতের দশকে এবং তার পরেও যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন নতুন আঙ্গিকে, নতুন বক্তব্য নিয়ে গান তৈরি করতে, গায়ক হিসাবে তাঁরা কতটা গ্রহণযোগ্য ছিলেন সেটা খুব বড় প্রশ্ন। এ-ব্যাপারে নিজের সম্পর্কে এবং সঙ্গীত সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্তী হওয়ার দরুণ সযত্নে পালিত কোন আত্মশ্লাঘা বা অভিমান নিতান্তই অকাজের। বক্তব্য যত জরুরি আর ভালই হোক, যে গায়ক/গায়িকার কণ্ঠ থেকে সেটি বেরচ্ছে সেই কণ্ঠ ও গায়কী লোকের যদি ভাল না লাগে তো মুশকিল। গানের রচয়িতা যদি নিজে এমনিতে ভাল গায়ক না হন তো খুব ভাল গানও মাঠে মারা যেতে পারে।

সাতের দশকে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন ব্যক্তির নতুন গান বাঁধার বিক্ষিপ্ত প্রয়াস ১৯৪৩ সালে যশোদাদুলাল মণ্ডলের ঐকিক প্রয়াসের কথা মনে করিয়ে দেয়। ১৯৯২ সালে 'তোমকে চাই' প্রকাশের পর নতুন বাংলা গানের জোয়ার যখন এল তখন টেলিভিশনে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের মত রঞ্জনপ্রসাদকেও দেখা-শোনা গিয়েছে। তেমনি, রাজনৈতিক বক্তব্যসম্বলিত গান রচনার কাজে বিপুল চক্রবর্তীও সক্রিয় হয়েছিলেন। সুলেখক বিপুল চক্রবর্তীর গানে বরং আধুনিক বাংলা গানের ধারার স্পর্শ পাওয়া গিয়েছিল। সাত, আট ও নয়ের দশকে গণসঙ্গীত পর্যায়ে অনুপ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠেও শোনা গিয়েছিল কবিতায় সুরারোপিত কিছু নতুন গান। আধুনিক বাংলা গানের ধারার সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত ও বাংলা গানপ্রেমী অনুপ মুখোপাধ্যায় ও বিপুল চক্রবর্তীর মত গীতিকার-সুরকার যদি নয়ের দশকে বাংলা গানের ইণ্ডাস্ট্রিতে গীতিকার ও সুরকার হিসাবে কাজ করতে পারতেন তাহলে এই ক্ষেত্রটি উপকৃত হত বলেই মনে হয়। আটের দশকে বিনয় চক্রবর্তী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কিছু কবিতায় তাক লাগানোর মত সুর দিয়েছিলেন। 'আমার মা যখন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছ' আর 'তোর কি কোনও তুলনা হয়' তাঁর উঁচু মানের দুটি কাজ। আফশোষের বিষয়, তিনিও সুরকার হিসেবে বাংলা গানের ইন্ডাস্ট্রিতে এলেন না। অথবা, বাংলা গানের জগৎ তাঁর কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতে পারল না।

বাংলার নাগরিক সমাজে পাশ্চাত্যের 'রক্' আঙ্গিকে বাংলা গান তৈরি করে তা পরিবেশন করার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কেউ বা কোন শিল্পীগোষ্ঠী নন, বাংলাদেশের আজম খান। অজ্ঞতা ও সেইসঙ্গে সম্ভবত উন্নাসিকতার কারণে পশ্চিমবঙ্গের 'বাংলা রক্'-আলোচক ও বোদ্ধারা সাতের দশকের গোড়ার দিকে প্রতিবেশি বাংলা দেশে 'বাংলা রকের' যে উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু বলেন না। এতে ইতিহাসনিষ্ঠার অভাব ছাড়া আর কিছুই প্রতিফলিত হয় না। কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গে সাতের দশকে এখানকার প্রধানত ইংরিজি গান-ঘেঁষা কয়েকজন নাগরিক শিল্পী বিচ্ছিন্নভাবে কিছু গান তৈরি করে ও সুযোগ অনুযায়ী প্রকাশ্যে পরিবেশন করে গানের শ্রোতাদের ওপর

boiRboi.com

বলার মত কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। বাংলাদেশের 'বাংলা রক্' শিল্পীরা কিন্তু সাতের দশকের গোড়ার দিক থেকেই প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন তাঁদের দেশে, যুবসমাজের ওপর।

আজম খান ও বাংলাদেশের রক্ জোয়ার সম্বন্ধে কিছু বলার আগে ভেবে দেখা দরকার 'বাংলা রক্' বলতে কী ধরনের সঙ্গীত বা গান বোঝায়। প্রথমত, সঙ্গীতের বিচারে এই গানগুলি আধুনিক বাংলা গানের ইডিয়মগুলি ও কাঠামোর বাইরে। কাঠামোর দিক দিয়ে এগুলির মিল বরং ইংরিজিভাষী দুনিয়ায় লোকসঙ্গীত ও জনপ্রিয় লঘু সঙ্গীতের সঙ্গে। ওই দুই শ্রেণীর গানের কাঠামো : স্তবক/কোরাস বা ধুয়ো/দ্বিতীয় স্তবক/একই কোরাস বা ধুয়ো/তৃতীয় স্তবক/একই কোরাস বা ধুয়ো—ইত্যাদি। বাংলার অধিকাংশ গোত্রের পল্লীগীতি ও আধুনিক গানের সাধারণ কাঠামো : স্থায়ী/অন্তরা/স্থায়ীতে ফেরা/সঞ্চারী (যদি থাকে)/দ্বিতীয় অন্তরা/স্থায়ীতে ফেরা।—অন্তরার সংখ্যা তিন হলেও কাঠামো একই থাকে। 'বাংলা রক্' শিল্পীরা এই কাঠামো রক্ষা করেন না। গায়কীর ক্ষেত্রে, আধুনিক বাংলা গানে সাধারণত কণ্ঠপ্রক্ষেপ, স্বরপ্রক্ষেপ হয় সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোন নাটক বা চলচ্চিত্রের কোন দৃশ্যের প্রয়োজনে মঞ্চশিল্পী বা নেপথ্য-গায়ক-গায়িকাকে হয়ত গানের বিশেষ কোন জায়গা হঠাৎ মাত্রাতিরিক্ত জোর দিয়ে বা আগের অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনভাবে উচ্চকিত, তীর্যক বা কর্কশ ভঙ্গিতে গাইতে হতে পারে। অথবা, নাটক বা চলচ্চিত্রের গান না হলেও গানটির কথা, সুর ও ভাব হয়ত এমন যে বক্তব্যের প্রতি সুবিচার করতে গেলে গানটি একটি বিশেষ ভঙ্গিতে গাইতে হবে যা তীব্র, জোরাল, এমনকি কর্কশ। কিন্তু সচরাচর আধুনিক বাংলা গানে কণ্ঠপ্রক্ষেপ সুসমঞ্জস হয়ে থাকে। হিন্দুস্তানী ও দক্ষিণ ভারতীয় মার্গসঙ্গীতেও তাই, যদিও সরবিস্তার, তান ও সরগম করার সময় কোথাও কোথাও আবেগ বা অন্য কোন রস অথবা বিশেষ কোন আঙ্গিকের কিসিম ফুটিয়ে তোলার জন্য কণ্ঠশিল্পী গলাটা একটু উচ্চগ্রামে বা অন্য রঙে লাগাতে ও খেলাতে পারেন। এটা স্বীকৃত। কিন্তু সেই গোত্রের কণ্ঠসঙ্গীতেও বন্দিশ গাওয়ার সময় বা এমনিতে, রাগরূপ ফুটিয়ে তোলার সময়, স্বরবিস্তার-তান-সরগমের সময় কণ্ঠপ্রক্ষেপ সুসমঞ্জস ও মসৃনই হয়ে থাকে। 'রক্' আঙ্গিকে কিন্তু ধরেই নেওয়া হয় যে গায়কের এই দায় নেই। শুধু তাই নয়। প্রথম থেকে এবং আগাগোড়া (অনভ্যস্ত কানে বিসদৃশ লাগতে পারে) জোরাল মায় কর্কশ ভঙ্গিতে (বেসুরে নয়) গান গাওয়ারই দায় থাকে যেন রক্ শিল্পীদের। তার প্রধান কারণ, পাশ্চাত্যে, সুললিত ভঙ্গিতে একই ধরনের গান গেয়ে যাওয়ার স্বস্তিদায়ক কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে নতুন, অস্বস্তিদায়ক বক্তব্যের উচ্চাণের জন্যেই রক্ আঙ্গিক সৃষ্টি। পপ্ আঙ্গিকটি কতকটা আধুনিক বাংলা গানের প্রচলিত ধারার মত। কণ্ঠপ্রক্ষেপ ও যন্ত্রাণুষঙ্গের সামগ্রিকতায় স্বস্তিদায়ক, অধিকাংশত মসৃন। এখানেই তার বিনোদনমূল্য। আকস্মিক কোন উচ্চকিত স্বরপ্রক্ষেপ সেখানে অচল। উঁচু পর্দায় যাওয়ার সময়ও কণ্ঠশিল্পীকে

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

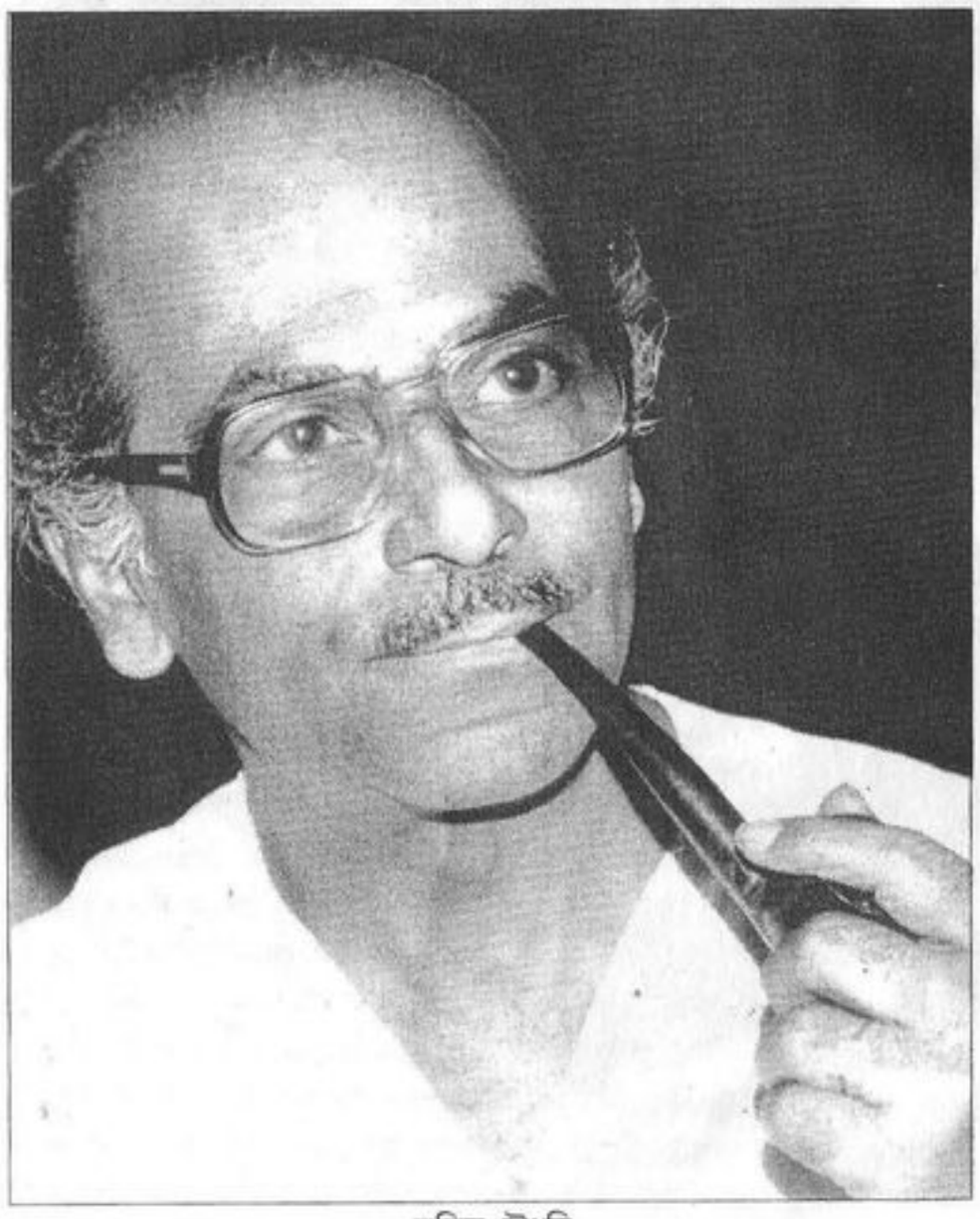

সলিল চৌধুরি

সঙ্গীতাচার্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

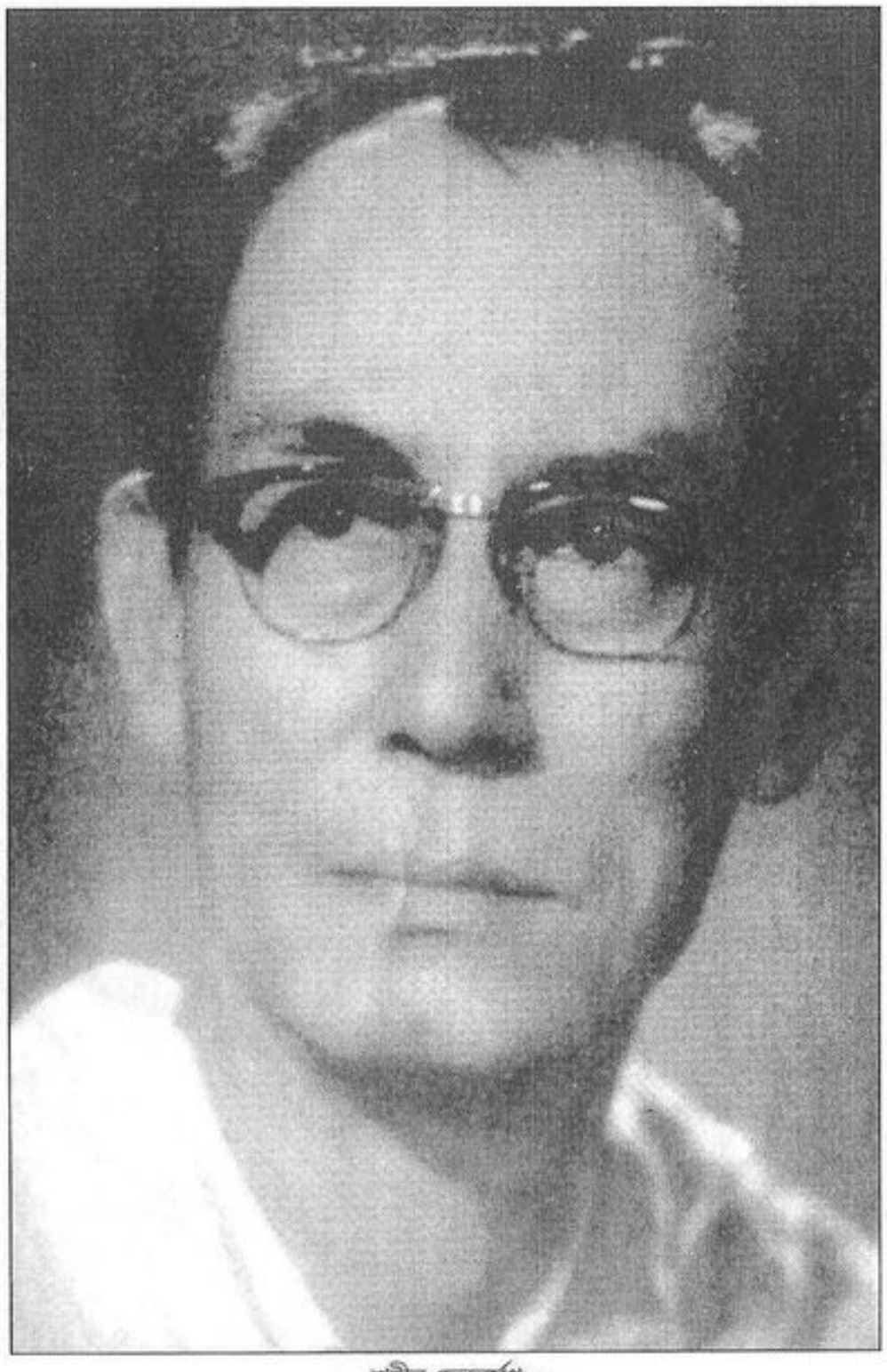

শচীন দেববর্মণ

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

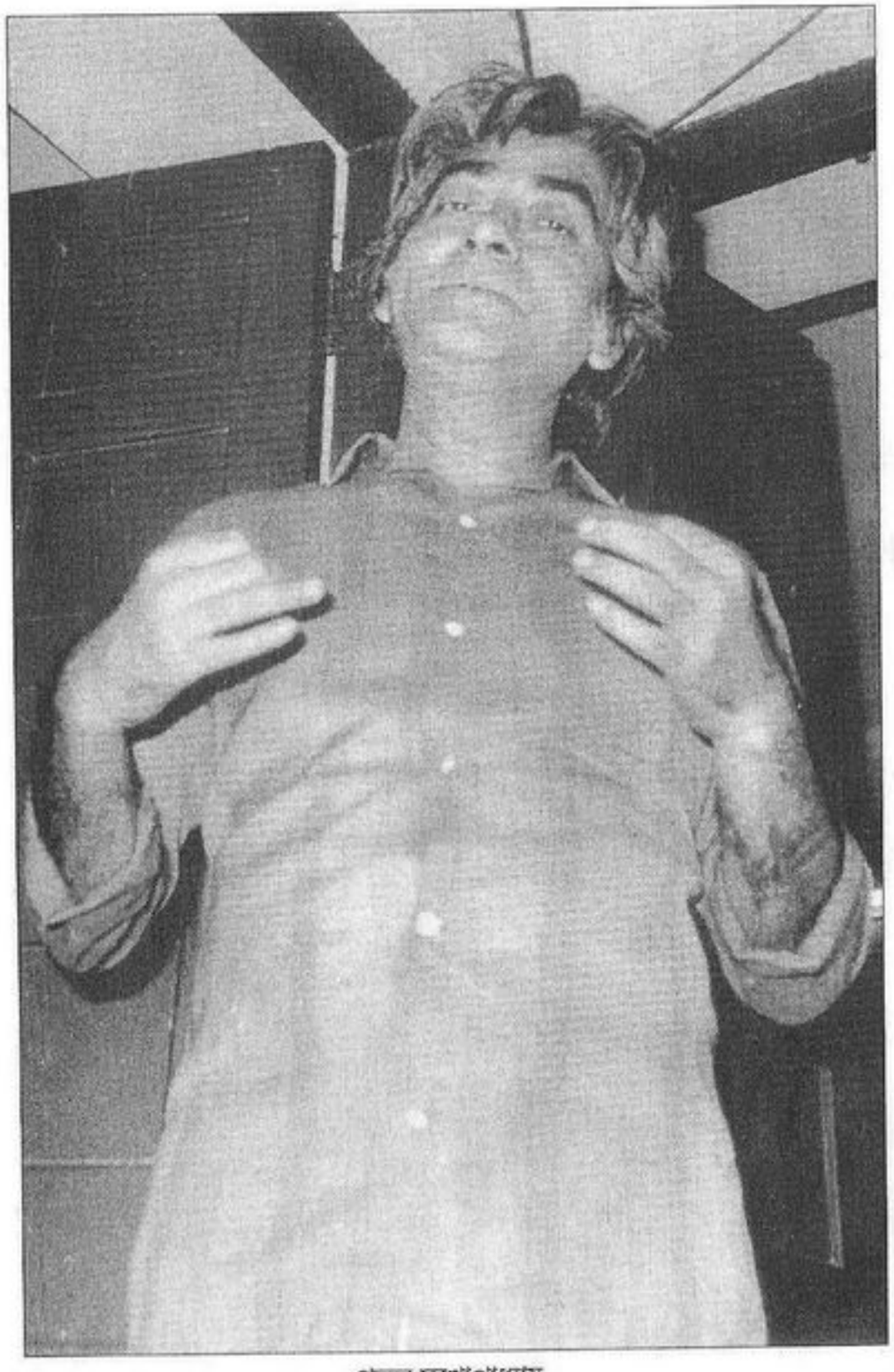

প্রতুল মুখোপাধ্যায়

নচিকেতা ঘোষ

সুধীন দাশগুপ্ত

মধ্যসপ্তকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হয়। যার গলা চড়ায় যত স্বচ্ছন্দই হোক, উঁচু পর্দায় যাওয়ার সময় মধ্য সপ্তকের চেয়ে বেশি জোর লাগবেই, কারণ তখন ফুসফুস থেকে বেশি হাওয়া বের করতে হয়। সেই কাজটি যিনি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে করতে পারেন, কণ্ঠশিল্পী হিসেবে তিনিই গ্রাহ্য ও বরেণ্য। রক্ আঙ্গিকে কিন্তু স্বরপ্রক্ষেপের সামঞ্জস্য রক্ষা করার এই শর্তটি নেই। বরং সেটিকে অগ্রাহ্য করার মধ্যেই রক্ শিল্পীর স্বকীয়তা এবং অস্তিত্বের যুক্তি। মনে রাখা দরকার, গ্রামোফোন রেকর্ডিং চালু হবার পর কয়েক দশক ধরে পাশ্চাত্যের প্রথাগত আধুনিক গানের বিষয় ছিল প্রধানত প্রেম। সেই প্রেমের অভিব্যক্তিও ছিল বেশিরভাগ আধুনিক বাংলা গানের মত মোটের ওপর একই রকম সৌখিন, সাজানো-গোছানো। গানের মাধ্যমে অন্য বক্তব্য পেশ করার তাগিদে পাশ্চাত্যের এক শ্রেণীর শিল্পী যুক্তিসঙ্গতভাবে অন্য গায়কী সন্ধান করতে থাকেন। নতুন বক্তব্যসম্বলিত লোকগানের আন্দোলনে সংরাইটার-গায়করা বর্জন করেন সে-যুগের কেতাদুরস্ত 'সৌখিন' গায়নভঙ্গি। খোলা গলায়, অনাড়ষ্ট ভঙ্গিতে, দরকার হলে একটু অমসৃনভাবেও গান গাইতে থাকেন তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে মাত্র গুটিকয়েক যন্ত্র বাজত। সাধারণত একটি গিটার, বেশি হলে একাধিক গিটার, হয়ত একটি 'ফিড্‌ল্' বা লোকায়ত আঙ্গিকে বাজানো বেহালা, একটি তালযন্ত্র। সবই কিন্তু 'একুস্টিক', অর্থাৎ একটিরও আওয়াজ বৈদ্যুতিক এম্পলিফায়ারের সাহায্যে আলাদা করে বাড়িয়ে দেওয়া হত না। যন্ত্রের সামনে মাইক্রোফোন রাখা হত বড়জোর। কিন্তু বৈদ্যুতিক গিটার, কীবোর্ডস (যেমন ইলেকট্রিক অর্গ্যান) ইত্যাদি উদ্ভাবনের পর পপ্ সঙ্গীতে সেগুলি ব্যবহার করা হতে থাকে। যতদিন এই ধরনের যন্ত্র ছিল না, লঘু সঙ্গীতে একুস্টিক যন্ত্রই ব্যবহার করা হত। কিন্তু রক্ সঙ্গীতের উদ্ভব বৈদ্যুতিক যন্ত্রের যুগে। শুধু তাই নয়। ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি ও নিত্যনতুন ইলেকট্রনিক যন্ত্র উদ্ভাবন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক বাজনার আওয়াজ নানান ধরণের ফিলটারের সাহায্যে ইচ্ছেমত বাড়ানো কমানো এবং পালটে দেওয়ার উপায়ও আবিষ্কৃত হল। ইলেকট্রিক গিটার থেকে এমন আওয়াজ বের করা সম্ভব হয়ে উঠল যা অতীতে কল্পনাও করা যেত না। ইকুস্টিক যন্ত্রে যে ধ্বনি অসম্ভব, ইলেকট্রনিক যন্ত্রে তা সম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। 'সিন্থেসাইজার' যন্ত্র উদ্ভাবনের পর বিভিন্ন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ মিশিয়ে 'লো-পাস্' ও 'হাই-পাস্' ফিলটারের সাহায্যে এমনিতে-অসম্ভব বিচিত্র ধ্বনি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে উঠল। যন্ত্রসঙ্গীতের চরিত্র ও ধ্বনিবৈশিষ্ট পালটে যেতে লাগল প্রতিনিয়ত।

রক্ সঙ্গীত বৈদ্যুতিক বাজনার যুগের সঙ্গীত। আধুনিক সঙ্গীতের আলোচনায় এটা মনে রাখা জরুরি। সিন্থেসাইজার যন্ত্র জলভাত হয়ে ওঠার আগেই রক্-এর উদ্ভব, কিন্তু ইলেকট্রিক গিটার ও ইলেকট্রিক অর্গ্যানের সঙ্গে সে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। একুস্টিক যন্ত্রের সঙ্গে রক্ চলে না। ইলেকট্রিক বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ একুস্টিক যন্ত্রের চেয়ে বেশি জোরালো বলে তার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে রক্ গায়কদের আরও জোরে গাইতে হয়। ইলেকট্রিক গিটার ও কীবোর্ডস দিয়ে যন্ত্রীরা আবার নানান 'এফেক্টস প্রসেসরের' সাহায্যে বিচিত্র সব ধ্বনি (মনে রাখা দরকার এই ধ্বনিবৈচিত্র কিন্তু শিল্পী ও শ্রোতার মনে নানান আবেগ সঞ্চার করতে পারে, অতএব এই ব্যাপারটিকে হালকাভাবে দেখা অনুচিত) বের করতে পারেন, করেনও। তাই রক্ গায়ককে সেই বুঝে কণ্ঠপ্রক্ষেপ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই, এই আঙ্গিকের কারণে গায়কী হয়ে ওঠে আরও উচ্চকিত, জোরাল, কাটা কাটা, অমসৃন। গুণগতভাবে এটা কিন্তু অসাঙ্গীতিক নয়। আমাদের দেশে অনেক শ্রোতার মনে রক্ সম্পর্কে ভুল ধারণা আছে—খানিকটা পাশ্চাত্যের ভাল রক্ আঙ্গিক না শোনার কারণে, খানিকটা সাংস্কৃতিক দূরত্বের কারণে, আর খানিকটা আমাদের দেশগুলির 'রক্ শিল্পীদের কারণে।

বাংলাদেশের 'বাংলা রক্' এবং কিছুটা হলেও এখনকার 'বাংলা রক্' নিয়ে কিছু ভাবা বা বলার আগে রক্ গায়কীর চারিত্রিক দিকটা, কিভাবে কোন অবস্থায় তার উৎপত্তি এবং সঙ্গীতের মঞ্চে ও রেকর্ডি-এ তার প্রয়োগই বা কেমন এই দিকগুলি মাথায় রাখা একান্ত দরকার। সবচেয়ে ভাল হয় এই লেখার পাঠক যদি ছয় ও সাতের দশকের ধ্রুপদী রক্ শিল্পীদের গানবাজনা শুনতে চেষ্টা করেন। তাহলে তাঁরা বুঝতে পারবেন আঙ্গিকটি একসময়ে তার জন্মস্থানে কেমন ছিল এবং 'বাংলা রক' তা থেকে সব দিক দিয়েই কতটা দূরে। কলকাতায় মহীনের ঘোড়াগুলি যখন গানবাজনা শুরু করেন, তখন কিন্তু তাঁরা ঠিক রক আঙ্গিক অনুসরণ করছিলেন না। তাদের মধ্যে তেমন কোন উচ্চকিত ভাব ছিল না। ছিল বরং 'পপ্'-এর স্বস্তিদায়ক মসৃনতা। বাংলা দেশে, সোত্তরের গোড়ায় যে বাংলা রক্ শুরু হল তা কিন্তু গায়কী ও ইলেকট্রিক বাদ্যযন্ত্র প্রয়োগের দিক দিয়ে মূল রকের আরও কাছাকাছি। লিরিক বক্তব্য এবং অস্তিত্বের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে নানান বিষয়ে নতুন গান রচনার দিক দিয়ে নয়। বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার

যে গত চার দশকে দুনিয়াজুড়ে তার বিভিন্ন অবিব্যক্তি সত্বেও রক্ কিন্তু পরিশীলিত এক সঙ্গীত-আঙ্গিক। হঠাৎ কোন খামখেয়াল বা অপটুত্ব থেকে এর উৎপত্তি নয়। বড় বড়, উঁচুমাত্রায় প্রশিক্ষিত ও ওস্তাদ শিল্পীরা, বিশেষ করে যন্ত্রীরা এই আঙ্গিক নিয়ে এক নাগাড়ে কাজ করে গেছেন, আজও করছেন। জন উইলিয়ামসের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'ক্লাসিকাল গিটারশিল্পী', যিনি পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল গিটারের এক কুলগুরু আন্দ্রেস সেগোভিয়ার নিজের হাতে তৈরি ছাত্র, ধ্রুপদী সঙ্গীত ছেড়ে রক-এ চলে যান। কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, ধ্রুপদী সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি আজকের যুগের কথাগুলি, ভাবগুলি আর প্রকাশ করতে পারছেন না। তেমনি, জ্যাজ সঙ্গীতে উচ্চমানের দক্ষতার অধিকারী শিল্পীরাও রক্ সঙ্গীতে আত্মনিয়োগ করেন, যেমন আমেরিকার আল ডি মিয়োলা। আরও অনেক বাঘা বাঘা শিল্পী রক-এর সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, যেমন এরিক ক্লাপটন, যাঁকে অনেকেই গিটারের ঈশ্বর মনে করেন। তেমনি, রক্ লিরিক রচনাতেও যুগান্তকারী কাজ হয়েছে কয়েক দশক ধরে। লোকসঙ্গীতের আঙ্গিক ছেড়ে বব ডিলানের মত লিরিক-শিল্পী রক্ ব্যাণ্ড গড়ে তোলেন। তাঁর অসামান্য লিরিকশৈলীর স্টেটমেন্ট রক্ সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে। লিরিক-রচনায় সর্বকালের বিস্ময় লেনার্ড কোহেন আগাগোড়া রক্-এর সঙ্গেই যুক্ত। এমন উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। বড় বড় সঙ্গীতশিল্পী ও লিরিক-শিল্পীদের অবদানের মধ্যে দিয়ে রক্ হয়ে উঠেছে অত্যন্ত পরিশীলিত, বাঙময়, বিচিত্র ও যুগোপযোগী এক আঙ্গিক। বিষয়বস্তু ও সাঙ্গীতিক-অভিব্যক্তির পরিবর্তনশীল সমন্বয়ে রক্ মানবজাতির এক গুরুত্বময় সৃষ্টি। বাংলাদেশে ও তারপর পশ্চিমবঙ্গে বাংলা রক্ নামে যা শুরু হয়েছিল এবং আজও চলছে তা সাঙ্গীতিকভাবে ও লিরিকবৈশিষ্টের দিক দিয়ে পাশ্চাত্যের বিরাট রক্ ধারার ধারেকাছেও আসে না। পাশ্চাত্যের অনুকরণে নানান ইলেকট্রনিক ধ্বনি নির্মাণ যন্ত্রের সাহায্যে ইলেকট্রিক গিটার, কীবোর্ডস এবং ড্রামস্ প্রয়োগ এবং উচ্চকিত গায়নভঙ্গি ছাড়া সাধারণ বৈশিষ্ট বলতে কিছুই প্রায় ছিল না, আজও নেই। বিশেষ করে লিরিক রচনা ও শিল্প-সম্মত 'স্টেটমেন্ট'-এর দিকে দিয়ে বাংলার রক্ গোড়া থেকেই মারাত্মক দুর্বল। সেই দুর্বলতা নিয়েই বাংলার রক্ সম্রাট আজম খানের শুরু। কিন্তু আজম খান থেকে বাংলাদেশে যে ব্যাপারটি শুরু হল, বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ, বিশেষ করে তরুণ সমাজের ওপর তার বিপুল প্রভাবের কারণে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই 'ফেনমেনন'টি লক্ষ্য করার মত, আলোচনা করার মত।

বাংলাদেশের গানের মঞ্চে আজম খানের আবির্ভাব বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাওয়ার পরেই। 'ওরে সালেকা ওরে মালেকা ওরে ফুলবানু পারলি না বাঁচাতে', 'রেললাইনের ঐ বস্তিতে', 'আমি যারে চাই রে', 'অনামিকা, চুপ' ইত্যাদি গানের জন্য তিনি অল্পকালের মধ্যেই বাংলাদেশে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সেই জনপ্রিয়তার মাত্রা ও পরিসর পশ্চিমবঙ্গের কোন শিল্পী বা এ-

রাজ্যের শ্রোতাকুল কল্পনাও করতে পারবেন না। আজম খান নিজে কোন যন্ত্র বাজিয়ে গাইতেন না। তাঁর গানের সঙ্গে গিটার, কীবোর্ডস, ড্রামস বাজাত। দশ বারো বছর আজম খান ছিলেন বাংলাদেশের একচ্ছত্র রক-সম্রাট। তারপর তিনি আর গান করেননি। কিন্তু আজও তিনি যদি গান করতে মঞ্চে ওঠেন তো দর্শক ও ভক্ত সমাগম যা হবে তা দুই বাংলার অন্য কোন শিল্পীর ভাগ্যেই জুটবে না। তাঁর অসংখ্য ভক্তের কাছে তিনি আজও 'গুরু।' লক্ষ লক্ষ বাঙালির মনে তাঁর অদ্ভুত আবেদনের কারণে ক্ষীণকায়, লম্বা, আপনভোলা, প্রতিষ্ঠানবিমুখ, প্রচারনিস্পৃহ আজম খান সিরিয়াস গবেষণার বিষয় হতে পারেন। সঙ্গীত ও সমাজের সম্পর্ক বাংলার বিদ্বজ্জনদের মস্তিষ্কে কোনদিনই তেমন গুরুত্ব পায়নি (ফলে এই 'মস্তিষ্কটি'ও আমার মতে গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত)। আর আধুনিক সঙ্গীত ও তার সামাজিক ভূমিকা তো বিষয় হিসেবে ব্রাত্যই থেকে গেল। তাই আজম খানের সঙ্গীত, পরিবেশনার আঙ্গিক ও গণ-আবেদন নিয়ে এখনও গবেষণাধর্মী কোন কাজই হল না, অকল্পনীয়রকম জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও আজম খান বাংলা দেশের সমাজে প্রান্তবাসীই থেকে গিয়েছেন। কিছু বছর আগে জনশ্রুতি ছিল যে তিনি ঢাকার কমলাপুর এলাকায় একটি ক্যাসেটের দোকান দিয়েছেন। পাড়ায় তিনি ফুটবলও খেলতেন।

সত্তর দশকের গোড়ায় বাংলার রক্-সম্রাট আজম খানের পর পাওয়া গিয়েছিল 'জিঙ্গা' গোষ্ঠীকে। ভাই-বোন-ভাবি (বৌদি) দের তৈরি এই 'ব্যাণ্ড' নিজেদের তৈরি গান গাইতেন, নিজেরাই গিটার, কীবোর্ডস, ড্রামস বাজাতেন। এঁদের গানের কথায় সময়সচেতনতার উপাদান ছিল না। সুরে ও গায়নভঙ্গিতে ছিল লঘু পাশ্চাত্যসঙ্গীতের আদল। মন্দ্রকণ্ঠের অধিকারী এক ভাই 'বেস' গাইতেন, পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী বৃন্দসঙ্গীত, স্পিরিচুয়াল, গস্পের ইত্যাদি সমবেত-গানে যেমন কেউ কেউ 'বেস' বা মন্দ্র পর্দায় গান। এঁদের দুটি জনপ্রিয় গান ছিল—'দূরালাপনী দ্বারা হল নব পরিচয়' ও 'তোমার জীবনে এল কি আজ বুঝি নতুন কোন অভিসার।' 'রক্', 'পপ', বিলিতি যন্ত্রের সঙ্গত, বিলিতি গায়নরীতি—আর তারই মাঝখানে 'দ্বারা' আর 'নব'। গানের কথা সে-যুগের বাজারচলতি আধুনিক বাংলা গানের থেকে আলাদা কিছু নয়। মূল পার্থক্যটি ছিল গায়কী ও পরিবেশনায়। ভাবলে আশ্চর্য লাগে দু'হাজার সালের পর, এমনকি ২০০৪ ও ২০০৫ সালেও পশ্চিমবঙ্গে থেকে থেকেই যেসব 'আধুনিক' গান শোনা যাচ্ছে (কোন কোন গান আবার 'ব্যাণ্ডের') সেগুলির কথা মূলত ঐ ধরনেরই। অর্থাৎ তিরিশ-চল্লিশ বছরেও আধুনিক গানের কথা, ভাব ও আবেদন সম্পর্কে অনেক শহুরে, আধুনিক কেতাদুরস্ত বাঙালির মনে বিশেষ কোন পরিবর্তন হল না।

আজম খান ও জিঙ্গা গোষ্ঠীর গানের গ্রামোফোন রেকর্ডও হয়েছিল বাংলাদেশে। স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর কয়েক বছর বাংলাদেশে গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরি হয়েছিল। তারপর আর হয়নি। ফিরোজ সহি নামে এক গায়ক ঐ

সময় জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। 'ইস্কুল খুইলাছে রে মওলা' ও 'এক সেকেণ্ডের নাই ভরসা' তাঁর দুটি লোকপ্রিয় গান। একবার, ঢাকার শিল্পকলা একাডেমির একটি অনুষ্ঠানে 'এক সেকেণ্ডের নাই ভরসা' গানটি গেয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এসে একটি সিগারেট ধরিয়েই মারা যান এই শিল্পী। ঐ গানটির মর্ম আক্ষরিক অর্থেই প্রমাণিত হয়ে গেল যেন।

'রক'-আঙ্গিকে বাংলা গান গেয়ে বাংলাদেশে ফিরদৌস ওয়াহিদ, রেনেসাঁ গোষ্ঠী, জানে আলম, 'চাইম', 'সোল্‌স্' ব্যাণ্ডও খুব নাম করেছিলেন। ফিরদৌস ওয়াহিদ ও জানে আলম ছিলেন একক রকশিল্পী। ফিরদৌসের 'মামুনিয়া', রেনেসাঁ গোষ্ঠীর 'হৃদয় কাদামাটির কোনও মূর্তি নয়', 'সোল্‌স'-এর 'মন শুধু ছুঁয়েছে' বাংলাদেশের অনেক মানুষ আজও মনে রেখেছেন।

এইভাবে, সাতের দশক থেকেই বাংলাদেশে 'বাংলা রক্' আঙ্গিকের চর্চা রীতিমত শুরু হয়ে যায় এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ, বিশেষ করে যুবসমাজে তার বড় ধরনের প্রভাব পড়ে। এঁদের মধ্যে সবাই যে ঠিক পাশ্চাত্যের 'রক্' আঙ্গিকের হুবহু অনুকরণ করছিলেন তা নয়। যেমন 'জিঙ্গা' গোষ্ঠীর গানে পপ্ আঙ্গিকের প্রভাবই ছিল বেশি। খুঁটিয়ে শুনলে বোঝা যায়, বাংলাদেশের একাধিক 'রক্' শিল্পীর গানের সুরগত ও গায়কীগত আঙ্গিকে 'রক্'এর চেয়ে 'পপের' প্রভাবই বেশি ছিল। তবে সাধারণভাবে, এঁরা কেউই বাংলাদেশের আধুনিক গান ও ছায়াছবির গানের পরিমণ্ডলে থাকেননি। প্রধানত সঙ্গীত-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই শ্রোতারা এদের আওতায় আসতেন। উল্লেখযোগ্য, এঁদের গানে সামাজিক-রাজনৈতিক বা অস্তিত্বগত ভাবনা সাতের দশকে তেমন ধরা দেয়নি। লিরিকে এঁরা কেউই এমন কোন বিষয়বস্তু-আঙ্গিক সমন্বয় গড়ে তুলতে পারেননি যা এঁদের গানকে শিল্পের দিক দিয়ে বিশেষ স্থান দিতে পারে। সমান, হয়ত তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ : এই সব বাংলা রক্ গান যাঁরা লিখেছেন এবং আজও লিখছেন লিরিক লেখার ক্ষমতাই তাঁদের ছিল বা আছে বলে মনে হয় না। তাঁরা হয়ত খুবই অনুপ্রণিত, দারুণ উৎসাহী, নতুন কিছু বলতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু লিরিকে সেই কথা বলতে গেলে যেভাবে বলা দরকার সেই প্রকাশপদ্ধতি ও নির্মাণপদ্ধতির শিক্ষা ও চর্চা তাঁদের আছে বলে মনে হয় না। লিরিক নির্মাণের কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি নেই। সারা পৃথিবীর পল্লীগীতিকাররা যুগ যুগ ধরে নানান কথা নানান ভাবে বলতে চেয়েছেন ও পেরেছেন বিভিন্ন ধরণের সুরে তালে। আধুনিক গানেও এর অন্যথা হয়নি। কবিতার মত লিরিক নিয়েও মানুষ নিরন্তর পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে গেছে ও যাচ্ছে। কিন্তু বক্তব্যে লিরিকের শরীর দিতে গেলে কি কিছু শর্ত পালন করতেই হয়। মুক্ত ছন্দও কিন্তু নিয়মের অনুগামী। মুখের কথার মত লিরিকও প্রলাপের স্তরে চলে যেতে পারে যদি তা অসংলগ্ন হয়। এই অসলগ্নতাই আগাগোড়া পেয়ে বসেছে যেন এই ধরণের বাংলা গানে। ফলে, এক ধরণের ছেলেমানুষির ছাপ সর্বত্র। মোটামুটি চলনসই একটা গান লিখতে গেলেও ছন্দ ও মাত্রার যে বোধ

থাকা একান্ত দরকার, তাও এই ধরণের অধিকাংশ গানে পাওয়া যায় না। ভাল ভাল কথা শোনা যায়, শোনা যায় নিরুদ্দিষ্ট বা চ'লে যাওয়া প্রেমিকার জন্য হাহুতাশ, এমনকি মৌলবাদবিরোধী গর্জন বা কোন একটি বিষয় সম্পর্কে প্রবল আপত্তির কথা। কিন্তু তার মধ্যে না আছে স্তবক রচনার দক্ষতা, না আছে মাত্রাবোধ। দু'একটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে বেশিরভাগ সময় মনে হয় উদভ্রান্ত কোন মানুষের প্রলাপ। প্রতিটি গানের লিরিককে নির্মাণশৈলীর এক আদর্শ উদাহরণ হয়ে উঠতে হবে সে-দাবি সুস্থমস্তিষ্কের কোন মানুষই জানাবে না। কিন্তু গানের কথাগুলি শুধু শব্দ ও বাক্যের অসংলগ্ন সমষ্টি হয়ে উঠবে এটাও তো মেনে নেওয়া মুশকিল। পশ্চিমবঙ্গেও ন'এর দশক থেকে যে বাংলা রক ব্যাণ্ড সঙ্গীত জোরেসোরে শুরু হয় সেখানেও লিরিকনির্মাণ ও সুরচিন্তা-সুরপ্রয়োগের দিক দিয়ে তেমন কিছু খুব কমই পাওয়া গেছে যা সিরিয়াস বিবেচনার যোগ্য। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের এই পর্যায়ের গানবাজনা শুনে বরং মনে হয় বড় কোন মাঠে বা পরিসরে ভয়ানক জোরে আধুনিক এম্পলিফায়ার ও বড় বড় স্পীকারের মাধ্যমে এই 'সঙ্গীত' বিপুল সংখ্যক শ্রোতার সামনে শারীরিক কসরৎ ও অঙ্গভঙ্গি সহকারে (নিন্দার্থে বলা নয়, নিতান্ত বর্ণনা হিসেবে বলা) পরিবেশন করে শ্রোতাদের মাতিয়ে ও নাচিয়ে দেওয়াই ব্যাণ্ডশিল্পীদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সঙ্গীতের সমাজতাত্ত্বিক বিবেচনার দিক দিয়ে কিন্তু বলা দরকার যে সাতের দশকে বাংলাদেশের বাংলা রক্ ও পপ্ শিল্পীরা তাঁদের সমাজে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিলেন, কলকাতার 'মহীনের ঘোড়াগুলি' বা অন্য কেউ তা পারেননি ঐ আঙ্গিকের সঙ্গীতের মাধ্যমে। তাছাড়া, এই সঙ্গীত-আন্দোলন কলকাতার ঢের আগে ঢাকায় শুরু হয়েছিল। তেমনি এটাও উল্লেখযোগ্য যে ছ'এর দশক শেষ হবার ঠিক পরপরই কলকাতার গ্রামোফোন কম্পানি অফ ইণ্ডিয়া 'বাংলা পপ্' নামে যে ধরণের গানের রেকর্ড বের করেন, সুর-তাল-ছন্দ-গায়কী ও পরিবেশনার সম্মিলিত আঙ্গিকের দিক দিয়ে তা মহীনের ঘোড়াগুলির 'পপ্' প্রয়াসেরও আগেকার, যদিও এই শিল্পীদল সমবেত কণ্ঠ প্রয়োগ করেছিলেন এবং একটু অন্য ধরণের লিরিক লিখতে চেষ্টা করেছিলেন বলে তাঁদের আবেদন অন্যরকম ছিল।

'পপ'ই হোক আর 'রক'ই হোক, বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গে সাতের দশকে পাশ্চাত্যসঙ্গীতঘেঁষা যে গানগুলি তৈরি ও পরিবেশিত হয়েছিল সেগুলি কিন্তু লিরিকের দিক দিয়ে যুগচেতনার বাহন ছিল না। দুই দেশে ও সারা পৃথিবীতে তখন যে অবস্থা, সাধারণ মানুষের জীবনে যে ঘাতপ্রতিঘাত, নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবন তখন যে-রকম, সচেতন ব্যক্তির মনে তখন যে সব প্রশ্ন, সুখ-দুঃখ আশা-হতাশা স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন—তার কিছুই সাতের দশকের বাংলা পপ্ বা রক্ গানের লিরিকে, সঙ্গীতচিন্তায় ফুটে ওঠেনি। এই গোত্রের বাংলা গানগুলিতে মেলেনি নতুন কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসা বা অভিব্যক্তি। এঁদের প্রেরণাস্থলে ইংরিজিভাষী দুনিয়ার আধুনিক সঙ্গীতের কিছু অবয়ব স্পষ্টতই ছিল বলে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের যে কোন সিরিয়াস পর্যবেক্ষক বলতে বাধ্য হবেন যে পাঁচের দশকের পর থেকেই পাশ্চাত্যে বাস্তবমুখী, বিশ্বমুখী ও দার্শনিক দিক দিয়ে অন্তর্মুখী যে 'সংরাইটাররা' ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন তাঁদের প্রথাবিমুখ, বৈপ্লবিক লিরিকবৈশিষ্ট ও সঙ্গীতবৈশিষ্ট এঁদের আদর্শ ছিল না। এঁরা চাইছিলেন না গানের মাধ্যমে কোন মৌলিক প্রশ্ন তুলতে, কোন 'স্টেটমেন্ট' করতে। যুগমুহূর্তের গান-প্রফেট হওয়ার ক্ষমতা এঁদের ছিল না। সেই বৈশিষ্টের আভাস বরং সাতের দশকের গোড়ায় এমন একটি বাংলা গানে পাওয়া গিয়েছিল যেটি 'পপ' বা 'রক' নয়, নিতান্তই প্রচলিত আধুনিক বাংলা গানের ধারায়, একটি হারমোনিয়াম নিয়েই গাওয়া যায়: 'এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার।'—'রাত্রি সে তো স্বভাবে মলিন, তাকে সয়ে থাকা যায়/ভোরের আলোর পানে চেয়ে থাকা যায়/সে-ভোর অন্ধ হল, কী হবে এখন/তার যে কথা ছিল আলো দেবার।'—এই লিরিকে, সুরে এবং জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় তাঁর এই গানটি যেভাবে গেয়েছিলেন সেই গায়কীতে অনিবার্যভাবে ধরা দিয়েছেল সাতের গোড়ার নাগরিক অস্তিত্ব, ভাবনা, মন্তব্য, বাস্তবের পরিসরে সংবেদনশীল ব্যক্তির একান্ত উচ্চারণ। এই গানটি বরং 'স্টেটমেন্ট' হয়ে উঠতে পেরেছিল। আমার কাছে অন্তত সেই যুগমুহূর্তের জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় হয়ে উঠেছিলেন গানের একজন প্রফেট। পরিশীলিত লিরিকশৈলী, বহুব্যবহৃত রূপকল্প পরিহার করে লিরিক লেখার ক্ষমতা এবং উপযুক্ত সুরসংযোজনার দক্ষতা—সব মিলিয়ে তিনিই বরং বাংলা গানের এমন এক 'ভাষা' আনছিলেন যা আগে কখনও শুনিনি, যা প্রকৃত অর্থে আধুনিক, যুগোপযোগী।

আটের দশক যখন এল, পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক বাংলা গানের জগৎ ও ব্যবসা তখন এত নিষ্প্রভ যে, তা নিয়ে কোনও আলোচনাই চলে না। এই দশকে এ বিষয়ে আলাদা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলার কোনও হেতুও ছিল না। কারণ, শুধু দীর্ঘশ্বাস নয়, আধুনিক বাংলা গানের নাভিশ্বাস উঠছিল তার ঢের আগে থেকেই।

সাতের শেষ ও আটের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত অন্তরা চৌধুরির শিশুকণ্ঠে সলিল চৌধুরির কয়েকটি গান এবং ভূপেন হাজারিকার গাওয়া-সুর করা, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কিছু গানের অ্যালবাম গ্রামোফোন কোম্পানিকে ভাল ব্যবসা দিয়েছিল। মোটের ওপর ভাল ব্যবসা দিতে পেরেছিল সাতের দশকেই মান্না দে-র গাওয়া বছরের নানান ঋতুভিত্তিক ও রাগাশ্রয়ী গানের একটি অ্যালবামও। কিন্তু বাংলা গানের ক্ষেত্রে কোনও নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারেনি সেই গানগুলি। বরং ভূপেন হাজারিকার গানগুলি খুবই লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, মানুষ উৎসাহ নিয়ে শুনছিল। সত্যি বলতে, তাঁর অ্যালবামের বেশিরভাগ গান কিন্তু নতুন গান ছিল না। ওগুলি তাঁর বেশ কিছুকাল আগের সুর ও ভাব যা অসমীয়া ভাষায় এককালে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল আসামে। 'গঙ্গা বইছ

আমারবই.কম
amarboi.com

কেন' গানটি তার এক দশক আগে ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যারের পরিবেশনায় বারবার শোনা গিয়েছিল। অর্থাৎ, ওই যুগমুহূর্তের জোরালো প্রয়োজনে রচিত তেমন কোনও আধুনিক গান সেই সম্ভারে ছিল না। সার্বিক আবেদনে ছিল আধুনিক বাংলা গান নয়, গণসঙ্গীতের মেজাজ। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের অনুরণনই বহন করছিল 'আমি এক যাযাবর' অ্যালবামটি।

আটের দশকে বাংলা গানের ইন্ডাস্ট্রিতে পুরোদস্তুর পাওয়া গিয়েছিল হিন্দুস্তানি রাগসঙ্গীতে রীতিমতো তালিমপ্রাপ্ত এক কণ্ঠশিল্পীকে, কণ্ঠের ওপর যাঁর দখল উঁচু মানের। অজয় চক্রবর্তী। সঙ্গীতাচার্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ছাত্র তিনি। তাঁরই কথায়-সুরে আধুনিক গানের একটি অ্যালবাম তিনি করেন। গানগুলি নতুন ছিল না, কিন্তু রচনা ও গাওয়ার গুণে রসিক শ্রোতাদের আনন্দ দিতে পেরেছিল বৈকি। এর পর অজয় চক্রবর্তী আরও গানের ক্যাসেট করেন, আটের দশকে প্রকাশ্য গানের অনুষ্ঠানে হয়ে ওঠেন নিয়মিত শিল্পী। আজও নানান অনুষ্ঠানে পাওয়া যায় তাঁকে। কিন্তু অজয় চক্রবর্তীর বাংলা গানে যুগ, দৃষ্টিভঙ্গি, সঙ্গীতভাবনার চলমান বিবর্তনের কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। এদিক দিয়ে তিনি আরও কিছু গুণী কণ্ঠশিল্পীর মতো প্রথামাফিক। কথাটা কিন্তু নিন্দে-অর্থে বলা নয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ কণ্ঠশিল্পীরা তো আর নিজেরা গান বাঁধেন না। সেই দাবি তাঁদের কাছে করাও চলে না।

আটের দশকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের গানের জগতে ইন্দ্রাণী সেন, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুন্ধতী হোমচৌধুরির প্রতিষ্ঠালাভ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কণ্ঠমাধুর্য, কণ্ঠের ওপর নিয়ন্ত্রণ, একাধিক সপ্তকে স্বরপ্রক্ষেপে এঁদের দক্ষতা, স্বাভাবিক উচ্চারণ এবং বিভিন্ন ধরনের গান সাবলীলভাবে গাওয়ার ক্ষমতার নিরিখে এঁরা উঁচু মানের শিল্পী। চার, পাঁচ ও ছয়ের দশকের বড় শিল্পীদের পাশে এঁদের স্বচ্ছন্দে বসানো যায়। কয়েক দশক ধরে এঁরা শ্রোতাদের আনন্দ দিতে পেরেছেন। সত্যি বলতে, সার্বিক বিচারে এঁদের তুল্য কণ্ঠশিল্পী আটের দশকের পর মহিলাদের মধ্যে এসেছেন কিনা সন্দেহ।

পুরুষদের মধ্যে শিবাজি চট্টোপাধ্যায় ও সৈকত মিত্রও আধুনিক বাংলা গানের গায়ক হিসেবে আটের দশকেই সুনাম অর্জন করেন। তবে, শিবাজি চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সৈকত মিত্রের কণ্ঠে শ্যামল মিত্রের গায়কির প্রতিধ্বনি তাঁদের সঙ্গীতব্যক্তিত্বকে আটকে রেখে দিয়েছে একটি বিশেষ স্তরে।

পশ্চিমবঙ্গের এই মহিলা ও পুরুষ শিল্পীরা কিন্তু শুধু 'রিমেক' করেননি। পেশাদার-অপেশাদার গীতিকার-সুরকারদের বাঁধা আধুনিক গানের ক্যাসেট তাঁরা বিলক্ষণ করেছেন। অধিকাংশ গানে কিন্তু আধুনিক গানের প্রথাগত বৈশিষ্ট্যই পাওয়া গিয়েছে। যুগমুহূর্তনির্ভর কোনও নতুন উচ্চারণ, লিরিক-সুরের নতুন কোনও আঙ্গিক পাওয়া যায়নি। আবার বলছি, সে জন্য এঁরা দায়ী নন। গ্রামোফোন বা ক্যাসেট কোম্পানিগুলির কর্মকর্তাদের এই দিকটি ভেবে দেখা উচিত ছিল।

দক্ষ, পেশাদার গায়ক-গায়িকারা সবাই হঠাৎ নতুন ধারার গান লিখে সুর করতে শুরু করবেন, এ দাবি বা আশা বাতুলতা।

সাতের দশকের শেষদিকেই সঙ্গীত ইন্ডাস্ট্রি ও সঙ্গীতের বাজারে এমন একটি ব্যাপার এল সঙ্গীত, তার প্রতিরূপায়ণ, তার ব্যবসা, মানুষের গানবাজনা শোনা এবং সার্বিকভাবে সমাজে যার প্রভাব হল দূরপ্রসারি: মিউজিক ক্যাসেট। এই দশক থেকেই গ্রামোফোন ডিস্কের জায়গায় ক্যাসেটের প্রচলন হতে থাকে এবং ক্যাসেটের ব্যবহার বাড়তেও থাকে দ্রুতগতিতে। আটের দশকের মাঝামাঝির পর দেখা গেল বাংলা গানের ব্যবসায় গ্রামোফোন ডিস্কের জায়গাটা প্রায় পুরোপুরিই দখল করে নিয়েছে মিউজিক ক্যাসেট। এর পরিণামে আগের একাধিক বনিয়াদি ব্যাপার প্রায় ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল। প্রথমত কারিগরি দিক দিয়ে স্টুডিয়োয় কোনও কিছু রেকর্ড করে তার ক্যাসেট বের করা গ্রামোফোন ডিস্ক তৈরি করার চেয়ে ঢের বেশি সহজসাধ্য। দ্রুতগতিতে বিরাট সংখ্যায় ক্যাসেট কপি করার যে 'লুপ বিন মেশিন' দরকার তা দামি। সেই যন্ত্রব্যবস্থা বসাতে গেলে অনেক টাকা বিনিয়োগ করতে হয়, মেশিন চালানোর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক লাগে, উপযুক্ত শীতাতপনিয়ন্ত্রিত জায়গাও লাগে। এটা পুরোদস্তুর কারিগরি শিল্পের সামিল। কিন্তু আটের দশকের গোড়া থেকেই দ্রুতগতিতে একটি 'মাস্টার ক্যাসেট' থেকে একটি, দুটি বা তিনটি ফাঁকা ক্যাসেট কপি করার যন্ত্র এ দেশে তো বটেই, এই শহরেও একাধিক ব্যক্তির কাছে এসে গিয়েছিল। এই যন্ত্রগুলি ছোটখাটো কুটিরশিল্পের মতো ছোট্ট একটি জায়গায় বসিয়ে অদক্ষ মানুষকেও এগুলি চালানোর পদ্ধতি একটু শিখিয়ে দিয়ে দিব্যি একটা ব্যবসা চালানো যায়। ক্যাসেট কপি করার ওই যন্ত্র বিদেশ থেকে আমদানি করতে হলেও সেগুলি আকারে মোটামুটি ছোট, ফলে চোরাপথেও আনা সম্ভব ছিল, তাছাড়া লুপ বিন মেশিনের চেয়ে ওই ধরনের যন্ত্রের দাম অনেক কম। আটের দশকে কলকাতার বিভিন্ন ব্যবসায়ী তাই এই ব্যবসায় নেমে পড়েছিলেন।

গ্রামোফোন রেকর্ড করার ব্যাপারে কোম্পানিগুলি সেই সাবেককাল থেকেই একাধিক শর্ত আরোপ করে আসছিল। প্রধান শর্ত ছিল শিল্পীর যোগ্যতা। রেকর্ডিং, যন্ত্রশিল্পীদের পারিশ্রমিক, গ্রামোফোন ডিস্ক ছাপার খরচ— সব কিছু কোম্পানিগুলিই দিত। তাই তারা বুঝে নিত, যে-শিল্পীর গান তারা রেকর্ড করছে, বাজারে তাঁর কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা। নতুন শিল্পীদের বেলা কোম্পানিগুলি খুবই সতর্ক থাকত। ক্যাসেটের প্রচলন হওয়ায় যে কোনও স্টুডিও আর কিছু যন্ত্রী ভাড়া করে নিজের মতো গান রেকর্ড করে নিয়ে সেগুলি ক্যাসেটে কপি করিয়ে যে কোনও ছাপাখানায় গিয়ে প্রচ্ছদ ছাপিয়ে যে কোনও সংখ্যার ক্যাসেট মোড়কবন্দী করে বাজারে ছাড়ার বা ইচ্ছে হলে নিজেই জনে জনে বিক্রি করার রাস্তা খুলে গেল। রেকর্ড করার যোগ্যতার শর্তটি আর রইল না। আটের দশকেই কলকাতার চাঁদনিতে এমন অনেক সংস্থা গজিয়ে ওঠে, যাদের কাছে একটি মাস্টার টেপ বা মাস্টার

আমারবই.কম
amarboi.com

ক্যাসেট নিয়ে গেলে তারাই বরাতমাফিক ক্যাসেট কপি করিয়ে দিত, প্রচ্ছদ ছাপিয়ে দিত, মোড়কবন্দী করা ক্যাসেটগুলি কার্ডবোর্ড বাক্সে সরবরাহ করত বরাতদাতাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার টাকার বিনিময়ে কোনও একটি 'লেবেল' থেকে ক্যাসেট প্রকাশ করিয়ে দিত, যদিও সেই ক্যাসেট কোন দোকানি রাখবেন, এমন স্থিরতা ছিল না। অর্থাৎ টাকা খরচ করতে পারলে নিজের গান, বাজনা বা আবৃত্তির ক্যাসেট বের করা আর কোনও সমস্যাই রইল না ক্যাসেটের যুগ এ দেশে কায়েম হয়ে যাওয়ায়।

গ্রামোফোন ডিস্কের যুগ অস্তমিত হওয়া ও ক্যাসেট-যুগের জয়যাত্রা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার নানান জায়গায় রেকর্ডিং স্টুডিও গজিয়ে উঠতে লাগল। ঘণ্টা বা 'শিফট' অনুযায়ী ভাড়া নিলেই হল। তিন থেকে ছয়ের দশক পর্যন্ত (তখনও গ্রামোফোন ডিস্কের যুগ) সঙ্গীত পরিচালক ও তাঁর সহকারীই গানের রেকর্ডিংয়ে যন্ত্রসঙ্গীত রচনা ও পরিচালনা করতেন। ক্যাসেটের যুগ শুরু হওয়ার পর গ্রামোফোন কোম্পানিগুলি এবং সঙ্গীত ইন্ডাস্ট্রির এতকালের নিয়ম ও রীতি বাতিল হয়ে যাওয়ায় 'অ্যারেঞ্জার'দের আগমন ঘটল স্টুডিয়োয়। কেউ গান রেকর্ড করতে চাইলে গানগুলি তিনি ক্যাসেটে অ্যারেঞ্জারকে দেবেন; অ্যারেঞ্জার সেগুলির যন্ত্রানুষঙ্গ রচনা করে তার স্বরলিপি তৈরি করবেন, গায়কের আর্থিক ক্ষমতা অনুসারে অ্যারেঞ্জারই যন্ত্রশিল্পীদের নিয়োগ করবেন, চাইকি তিনিই বলে দেবেন কোন স্টুডিয়োয় রেকর্ডিং হবে; নির্ধারিত দিনে অ্যারেঞ্জাররাই যন্ত্রশিল্পীদের হাতে স্বরলিপি তুলে দিয়ে তাঁদের দিয়ে এবং গায়ককে দিয়ে মহড়ার পর পরিচালকের ভূমিকা নেবেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে রেকর্ডিং হয়ে যাবে। এইভাবে অনেক দক্ষ যন্ত্রশিল্পী অল্পকালের মধ্যে অ্যারেঞ্জার হয়ে উঠলেন। শুধু তাই নয়, শহরের নানান জায়গায় স্টুডিও তৈরি হয়ে যাওয়া, নিজের টাকায় বা কোনও সংস্থার আর্থিক দায়িত্বে ক্যাসেট প্রকাশের লক্ষ্যে গান রেকর্ড করতে আগ্রহী মানুষের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে যাওয়ায় অনেক নতুন যন্ত্রশিল্পীও হলেন তৈরি। অনেকেই নিয়মিত কাজ পেতে থাকলেন। পশ্চিমবঙ্গের যন্ত্রশিল্পীদের আয় আগের তুলনায় বেড়ে গেল।

কোনও কোনও রেকর্ডিং স্টুডিয়োর মালিক ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে এবং প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পূরণ করে ক্যাসেট কোম্পানি খুলে বসলেন। এই সব কোম্পানি তাদের পছন্দ অনুযায়ী শিল্পীদের গান রেকর্ড করে বাজারে ছাড়তে শুরু করল। শুধু তাই নয়, টাকার বিনিময়ে তারা যে কোনও ব্যক্তির গান বিক্রয়-উপযুক্ত চেহারার ক্যাসেটে সেই ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে লাগল। নির্মিত ক্যাসেটের সংখ্যা নির্ভর করত টাকার পরিমাণের ওপর। এই ধরনের ক্যাসেট দোকানিরা সচরাচর স্বেচ্ছায় রাখতে চাইতেন না। কিন্তু শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার উচ্চাশায় অনেকেই মানসম্মান খুইয়ে তাঁদের ক্যাসেট দোকানিদের পীড়াপীড়ি করে দোকানে রাখার ব্যবস্থা করে ফেলতে লাগলেন। বিক্রির ওপর অনেকে দোকানিকে কমিশনও

দিলেন। এইভাবে গানের ব্যবসার ও গানবাজনার দুনিয়ার একাধিক নতুন দিক খুলে গেল। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত গ্রাম বাংলার কত সরল মানুষ যে কলকাতা থেকে তাঁদের গানের ক্যাসেট বের করার লোভে জমিজমা বাঁধা রেখে বা মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে শেষ পর্যন্ত (দাদাঠাকুরের ভাষায়) 'মান আর money' দুটিই খুইয়েছেন, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। অনেক শখুরে মানুষও শিল্পী হিসেবে দাঁড়াতে চেয়ে একে তাকে ধরে প্রচুর টাকা খরচ করে ক্যাসেট বের করেছেন গজিয়ে ওঠা নানান কোম্পানি থেকে। সব দিক দিয়েই ঠকেছেন বেচারিরা!

৯

আর, বেচারি বাংলা গান? গ্রামোফোন রেকর্ডের যুগে ৭৮ আর পি এমের একটি ডিস্কে দুটি করে গান থাকত। ৪৫ আর পি এমের আমলে স্ট্যান্ডার্ড প্লে ডিস্ক হলে থাকত সেই দুটি গানই, আর 'একস্টেন্ডেড প্লে' হলে একটি ডিস্কে চারটি গান। পুজোর গান, বসন্ত বন্দনা বা অন্য কোনও উপলক্ষে কোনও শিল্পীর একেবারে চারটি নতুন গান বেরচ্ছে, এমন নজির বাংলা গানের ইন্ডাস্ট্রিতে নিতান্ত কমই ছিল। বড় বড় শিল্পীদেরও দুটি করে আধুনিক গানই বেরত। ৩৩ আর পি এমের লং প্লে রেকর্ডের আমলে একটি ডিস্কে আরও বেশি সংখ্যক গান থাকা সম্ভব হয়ে উঠল। কিন্তু কোনও শিল্পীর গাওয়া একেবারে টাটকা নতুন আধুনিক বাংলা গানের একটা আস্ত লং প্লে ডিস্ক বেরচ্ছে, এমন ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গীত ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাসে বড় জোর দু-একবার ঘটেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর, যেমন, বাংলাদেশের কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমীনের নতুন আধুনিক গানের একটি লং প্লে রেকর্ড বের করেছিল এইচ এম ভি। সচরাচর লং প্লে ডিস্কগুলি হত আগেই রেকর্ডে প্রকাশিত এক বা একাধিক শিল্পীর গানের সঙ্কলন। বরং কোনও শিল্পীর গাওয়া ও পর পর রেকর্ড করা রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতির লং প্লে ডিস্ক বের করেছে কোম্পানিগুলি, যেমন দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীত ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নজরুলগীতি।

ক্যাসেটের যুগে কিন্তু দুটি গানের ক্যাসেট বের করার উপায় রইল না। এমনকি চারটি গানের ক্যাসেটও নয়ের দশকের আগে বেরোয়নি, তাও দু-একজনের, যেমন পীযূষকান্তি সরকারের গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত। চারটি গানের ক্যাসেট লুপ বিন মেশিন ছাড়া বের করা মুশকিল। শুধু তাই নয়, তাতে পড়তায় পোষায় না। এক দফায় অন্তত আট-দশটি গান ক্যাসেটে থাকতেই হবে। এর ফলে সঙ্গীতকার ও শিল্পীদের ওপর চাপ বেড়ে গেল একবারে অনেকটা। গ্রামোফোন রেকর্ডের যুগের থেকে এ এক বিরাট ও মৌলিক ফারাক। একজন সঙ্গীতকার ও গীতিকার ও সুরকার একজন শিল্পীর জন্য ভেবেচিন্তে দুটি ভাল গান এক মরশুমে তৈরি করতেই পারেন। কিন্তু একবারে আট-দশটি গান! একাধিক গীতিকার ও সুরকারকে দিয়ে ওই গানগুলি তৈরি করালে গানগুলির মধ্যে যে সামঞ্জস্য থাকবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তেমনি, গ্রামোফোন রেকর্ডের যুগে কণ্ঠশিল্পীরা রেকর্ডিংয়ে যাওয়ার আগে বেশ কয়েক দিন ধরে দুটি গান শিখে, বারবার গেয়ে

সড়গড় করে নিতে পারতেন। ক্যাসেটের যুগে সেই অবকাশ আর রইল না। রেকর্ডিংয়ের খরচের কারণে খুব কম গায়ক-গায়িকাই যথেষ্ট সময় পান গানগুলি মন দিয়ে, ধরে ধরে গাওয়ার। যাঁরা নিজের টাকায় রেকর্ড করছেন, এমনকি যাঁরা কোম্পানির টাকাতেই রেকর্ড করছেন কিন্তু যাঁরা বাজারে ওজনদার নন (এমন শিল্পীই বেশি) তাঁদের কিন্তু যথাসম্ভব কম সময়ে আট-দশটি গান গেয়ে দিতে হয়। ফলে উৎকর্ষ মার খাওয়ার সম্ভাবনাটা বাড়ে। অন্যদিকে, একটি ক্যাসেট হাতে পেলে সব কটি গান মন দিয়ে বারবার শুনবেন, এমন ক'জন শ্রোতা থাকেন? বেশিরভাগ শ্রোতাই সব গান মন দিয়ে শোনেন না, শুনলেও বড় জোর একবার-দু'বার। ফলে বেশ কিছু গান সব ক্যাসেটেই কম-বেশি উপেক্ষিত হয়ে থাকে। গ্রামোফোন ডিস্কের যুগে (একটি ডিস্কে যখন দুটি গান থাকত) গান আরও ধীরেসুস্থে, মন দিয়ে শোনা যেত। ক্যাসেটের যুগে শুধু গান-নির্মাতা, গায়ক ও যন্ত্রশিল্পীদের ওপরেই নয়, শ্রোতা ও ক্রেতার ওপরেও চাপ গেল অনেকটা বেড়ে। এই সব ব্যাপারের প্রভাব বাংলা গানের ওপর খুব বেশি পড়েছে ক্যাসেটের যুগ কায়েম হয়ে যাওয়ার পর।

সাতের দশক থেকে বাংলা গানের জগতে যে যুগান্তকারী ব্যাপারগুলি ঘটে গিয়েছে, তার প্রধান সূত্রগুলি মনে রাখা জরুরি, যদি গান যে কোনও পথে গেল বা যেতে বাধ্য হল তা বুঝতে হয়:—

১ ক্যাসেটের যুগে গান লেখা, সুর করা ও গাওয়ার যোগ্যতার দিকটা প্রায় উঠে গেল। যোগ্যতা-যাচাইয়ের মানদণ্ডহীনতার রীতি হয়ে গেল কায়েম। অর্থাৎ যা খুশি তাই লিখে দেওয়া, সুর করে দেওয়া, গেয়ে দেওয়া সম্ভব।

২ কেউ একা ক্যাসেট করলেই তাঁর ওপর আটটি বা দশটি গান জোগাড় করা ও শিখে নেওয়ার চাপ এসে গেল। আর গান-নির্মাতাদের ওপর এসে পড়ল এক-একবারে অনেক গান তৈরি করার বাধ্যবাধকতা।

৩ কারিগরি পদ্ধতির দিক দিয়ে ক্যাসেট উৎপাদন ও প্রকাশ গ্রামোফোন ডিস্ক উৎপাদনের চেয়ে অনেক সহজ এবং যে কেউ নিজের টাকায় ব্যক্তিগত প্রকাশনা-উদ্যোগ হিসেবে অথবা কোনও কোম্পানির লেবেলে যে কোনও সময় ক্যাসেট বের করতে পারেন বলে বাংলা আধুনিক গানের ক্যাসেটের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগল। কিন্তু ভাল গান বা সত্যি বলতে গান হিসেবে আদৌ মেনে নেওয়া যায় এমন গানের সংখ্যা বাড়ল না, বরং আশঙ্কাজনক মাত্রায় কমতে লাগল।

অতি-উৎপাদন যে কোনও ক্ষেত্রেই ভয়াবহ পরিণামের দিকে ঠেলে দেয় মানুষ ও সমাজকে। আটের দশক থেকে আমাদের দেশে নতুন নতুন ক্যাসেট প্রকাশের যে ঘনঘটা দেখা দিল, তা বিস্ময়কর। এর বেশিরভাগটাই অপচয়ের

সাক্ষ্য বহন করেছে, আজও করছে এবং চারদিক দেখে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতেও করে যাবে। উৎকর্ষ ও যোগ্যতার কোনও মাপকাঠি গানের রেকর্ডিং ও ব্যবসায় আর না থাকায় দেখা দিয়েছে এক চরম অরাজকতা।

নয়ের দশকে আধুনিক গানের যে পর্ব শুরু হল, তার কোথাও হয়ত এই অধমেরও সামান্য একটু ভূমিকা আছে, তাই ও বিষয়ে সবিস্তারে কিছু বলা আমার সাজে না। সে সময়ও এখনও আসেনি। কিন্তু নয়ের ঘটনাধারা নিয়ে আদৌ কিছু না বললে এই লেখাটি নেহাতই অর্থহীন হয়ে পড়ে, তাই কিছু লিখতেই হবে। সেই সঙ্গে আমার হয়ে ওঠার কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ না করলে পাঠকদের পরিপ্রেক্ষিত-ভাবনায় ফাঁক থেকে যেতে পারে।

আধুনিক বাংলা গানের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, দ্বন্দ্ব ও সমস্যা, সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে গানের ভূমিকা, আমার জীবনে ও যুগে বাংলা গানের স্থান ইত্যাদি বিষয়ে আমার মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল ছয়ের দশকের শেষ থেকেই। সাতের দশকের একেবারে গোড়ায় তা তীব্র হয়ে ওঠে। আমার জীবনের প্রথম সুরটি আমি দিয়েছিলাম তের-চোদ্দ বছর বয়সে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের একটি কবিতায়। সতের বছর বয়সে (১৯৬৬) আমি প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'কোনদিন গেছ কি হারিয়ে' কবিতাটিতে সুর করি। ১৯৬৭-৬৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মিউজিক ক্লাব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৃন্দসঙ্গীত দল তৈরি হওয়ার পর ওই গানটি আমরা গাইতামও। সতের বছর বয়স থেকেই আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে নিয়মিত আধুনিক বাংলা গান গাওয়ার তাগিদে আমি নিয়মিত সুরও করতে থাকি। সময়টা খেয়াল রাখা দরকার। ছয়ের দশকে আধুনিক বাংলা গানের লিরিকে সুর দিয়ে বেতারে বছরে অন্তত ছটি অনুষ্ঠানে গাইতে গেলে (প্রতিটি 'অনুষ্ঠান' হত পনেরো বা দশ মিনিটের) যথেচ্ছাচারের কোনও সুযোগ ছিল না। তখনও টেলিভিশন আসেনি পশ্চিমবঙ্গে। বেতারই ছিল একমাত্র মাধ্যম। অসংখ্য মানুষ নিয়মিত রেডিও শুনতেন এবং কোনও অনুষ্ঠানে পান থেকে চুন খসলে সমালোচকদের চিঠির ঝড় বয়ে যেত। মাথার ওপরে ছিলেন গুরুস্থানীয়, অভিজ্ঞ শিল্পীরা। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কণ্ঠশিল্পীরা তখন এক একটি জ্যোতিষ্কের মতো বিরাজ করছেন। সকলেই বেতারের সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলি মন দিয়ে শুনতেন, প্রয়োজনমতো তারিফ ও বকুনি দুটিই আসত তাঁদের কারুর কারুর কাছ থেকে। আকাশবাণীর কর্মকর্তারাও ছিলেন সজাগ। কোনও অনুষ্ঠান অপছন্দ হলে তাঁরা খোলাখুলি বলতেন। বেতার-অনুষ্ঠানে ভাল গাইলে, আধুনিক গানের সুর ভাল লাগলে তেমনি তাঁরা ডেকে প্রশংসা করতেন। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে তখন সঙ্গীতাচার্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ সঙ্গীত বিভাগের প্রযোজক। ছিলেন গোপাল দাশগুপ্তর মতো গুণী সঙ্গীতবোদ্ধা ও গীতিকার-সুরকার। দীপালি নাগ ছিলেন কলকাতা কেন্দ্রে। ভারতীয় ও বাংলার সঙ্গীতে দীপালি নাগের মতো মেধাবী, মননশীল, সৃজনশীল, শিক্ষিত মানুষ ও সঙ্গীতজ্ঞ সারা পৃথিবীতেই বিরল। আরও

অনেকের মতো তাঁর মূল্যায়ন তো দূরের কথা, তাঁর উল্লেখও কাউকে করতে দেখিনি কোথাও গত কয়েক দশকে। এই সমাজ ও এই জাতির সঙ্গীতবোধ ও সঙ্গীত যে ক্রমশ রসাতলে যাবে, তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে? এঁদেরই সঙ্গে ছিলেন এককালের বিখ্যাত ম্যান্ডোলিনশিল্পী, সুরকার, সঙ্গীতবোদ্ধা সুরেন পাল। পাশ্চাত্য সঙ্গীত বিভাগে ছিলেন বুলবুল সরকার, আর এক রসিক, বোদ্ধা মানুষ। কলকাতা কেন্দ্রের চাকুরে যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অলোকনাথ দে। এককথায় জিনিয়াস। ছিলেন ওস্তাদ আলি আহমেদ হুসেন।

শ্যামল বসুর মতো তবলাশিল্পী। মানিক পাল। বাংলার পল্লীসঙ্গীতের একাধিক যন্ত্রে সুদক্ষ ফণিবাবুর সঙ্গে রসকলি কাটা, কণ্ঠি-গলায় মন্দিরা-শিল্পী, মহারসিক 'বাবাজি' ছিলেন। এস্রাজে ছিলেন বিজলিবাবু। সকলেই দুর্দান্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ। সকলেই আমার গুরুস্থানীয়। আকাশবাণীর আধুনিক গানের অনুষ্ঠানে এঁরা সহযোগিতা করতেন। গানের সুরে বিসদৃশ বা অগ্রণযোগ্য কিছু কানে গেলে এঁদের মুখের ভাব সেইরকমই হত। অর্থাৎ, আধুনিক বাংলা গানের যে দীর্ঘ ধারা, তার আওতায় থেকেই সুর করতে হত, গাইতে হত। তার মানে এই নয় যে মার্কামারা কিছু বহুব্যবহৃত ছাঁচে ফেলতে হত প্রতিটা গান। মনে রাখা দরকার, উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের ওই সময় পর্যন্ত বাংলা গানের সুর বিচিত্র পথে গিয়েছে, ধারাবাহিক পরীক্ষানিরীক্ষায় সামিল থেকেছে।

আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকারদের গানেই সুর করতাম আমি : অমিয় চট্টোপাধ্যায়, মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়। একবার কবিতা সিংহর লেখা একটি গানও সুর দিয়ে গেয়েছিলাম। গানটি ছিল ব্যতিক্রমী। সূর্যবন্দনা। অনুমোদিত গীতিকাররা আধুনিক বাংলা গানের প্রচলিত রীতমাফিকই গান লিখতেন। তাঁরা জানতেন গানের কাঠামোর বিভিন্ন অংশ কেমন হওয়া দরকার। প্রত্যেকের গানেই সঞ্চারী-অংশটি থাকত। পরে আধুনিক বাংলা গানের দেহ থেকে সঞ্চারী প্রায় উঠেই গিয়েছে। আজকের অনেক সুরকার বোধহয় জানেনই না, সঞ্চারী রচনার প্রকরণ কেমন। ওই গীতিকারদের কোনও কোনও গান নিঃসন্দেহে রীতিমত সুলিখিত ছিল। কিন্তু ছয়ের দশকের শেষ ও সাতের একেবারে গোড়ায় আমি এই গানগুলিকে বা আবোল্য শেখা, গাওয়া কোনও গানকেই আর মন থেকে মেনে নিতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল— আমার সময়ের কথা, আমার কথা যদি গানের মধ্যে দিয়ে বলতে হয় তো আমায় গান লিখতে হবে। আত্মিক সঙ্কট এমনই হয়ে দাঁড়াল যে আকাশবাণীর অধিকর্তাকে চিঠি দিয়ে আমি ১৯৭৩ সালেই বেতার আধুনিক গানের অনুষ্ঠান করা একেবারে কমিয়ে দিই। ওই সময় থেকে অবিরাম চেষ্টা করতে করতে আমি ১৯৭৪ সালে প্রথম একটি গান লিখি, যেটি আমার মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল : 'এ কেমন আকাশ দেখালে তুমি/এ কেমন আকাশ জন্মভূমি।' আমার বয়স তখন পঁচিশ।

তারপর কিছু গান লিখেছি, কিন্তু ১৯৭৯ সালে আমার লেখা 'ভাল লাগছে না অসহ্য এই দিনকাল', 'কে তৈরি করেছিল তাজমহল', 'তোমার আমার স্বাধীনতা', শহিদ কাদরির একটি কবিতার প্রেরণায় 'রাষ্ট্র মানেই কাঁটাতারে ঘেরা সীমান্ত'— এই গানগুলি তৈরি করার পর এবং বন্ধুবান্ধবদের শোনানোর পর তবেই আমার মনে হতে শুরু করে যে আমি বোধহয় গান বাঁধতে পারি একটু-আধটু। তারপর থেকে আমি নিয়মিত গান রচনা করে চলেছি, থামিনি। কিন্তু আমার সেই গান বেঁধে যাওয়া ও গেয়ে যাওয়ার ত্রিসীমানায় এমন স্বপ্ন বা উচ্চাশা ছিল না যে গানগুলি অনেক লোক শুনবে। সত্যি বলতে অল্পবিস্তর লেখালিখি করে ও বিজ্ঞাপনে সঙ্গীতের কাজ করে (কারণ, ইলেকট্রনিক সঙ্গীতসৃষ্টির কাজটি আমি ১৯৮০ থেকেই ক্রমাগত শিখে গিয়েছি ও রপ্ত করেছি) নিজের খরচ চালিয়ে বাকি সময়ে বাংলা গান বাঁধব, গাইব, বন্ধুরা কখনও শুনবেন— এই রকম ধারণাই আমার ছিল। জীবন কী বিচিত্র, নানান পেশা, বিভিন্ন ঘাটের জল খেয়ে, গানবাজনাকে পেশা করার পর এই লেখাটি লেখার সময় (২০০৫ সালের আগস্ট মাস) আমি অনেকটা সেই সুখকর অবস্থাতেই পৌঁছে গিয়েছি। তবে বাংলা গান যে আমি ধারাবাহিকভাবে বেঁধে যাব, সঙ্গীত নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাব, সেই সঙ্কল্প আমার ১৯৭৯ থেকেই ছিল— কোনও ঐতিহাসিক কর্তব্যসাধন বা মহৎ উদ্দেশ্যে নয়, এই কাজটি আমি ভালমতো করতে শিখেছি এবং এই কাজটি করে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই বলে।

১৯৮৫ সালে আমেরিকার স্থায়ী চাকরি ছেড়ে কলকাতায় চলে এসে বন্ধুদের সঙ্গে গানবাজনা নিয়ে মেতে ছিলাম। তার মধ্যে আমি অনেক গান বেঁধে ফেলেছি এবং তখনও সমানে বেঁধে যাচ্ছি। তখনও একা গাইব — এই ভাবনাটি ছিল না। আমেরিকা থেকে ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই টের পেয়ে গেলাম রোজগারের কোনও ব্যবস্থাই করিনি আমি। সঞ্চিত অর্থ শেষ। কলকাতায় চাকরি খুঁজছি, এমন সময় ভয়েস অফ জার্মানি থেকে সিনিয়র এডিটরের চাকরির প্রস্তাব পেয়ে গেলাম। কিন্তু বাংলা গান নিয়ে কাজ করে যাওয়ার সঙ্কল্প থেকে আমি পেশাদার বেতার-সাংবাদিক হিসেবে আবার কাজ করার সুযোগ পেয়েও সরে আসিনি। জার্মানিতে আমি ৩৭ বছর বয়সে ক্লাসিকাল গিটার শিখতে শুরু করি। তার আগে কখনও গিটারে হাত দিইনি। আমি যদি চাইতাম, জার্মানি থেকে বেতার-সাংবাদিকতার কাজ নিয়ে পৃথিবীর অন্য কোথাও চলে যেতে পারতাম। সে চিন্তা আমার ছিল না।

১৯৮৯ সালে ভয়েস অফ জার্মানির চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ফিরে গান বাঁধতে বাঁধতে, একে-তাকে গান শোনাতে শোনাতে শেষে মনে হল কারুর কারুর ভাল লাগছে গানগুলো। ১৯৯০ সালের সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসে ইন্দ্রনীল গুপ্ত নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দৈবাৎ আলাপ হয়ে যায়। তিনি আমার তৈরি খানদুই গান শুনে ফেলেন। একদিন তিনি এসে উপস্থিত— সল্টলেক স্টেডিয়ামে

কলকাতা উৎসবে আমায় গান গাইতে হবে। আমার গান। কোনও আপত্তিই শুনলেন না তিনি। আমায় যেতে হল। কেউ আমায় চেনে না, আমার নাম শোনেনি, গান তো দূরের কথা। 'হেমন্ত মঞ্চে' বিভিন্ন নামী শিল্পী বাংলা গান গাইছেন। লক্ষ্য করলাম, শ্রোতারা নিস্তেজ। কেউ কেউ ঠোঙা থেকে খাওয়ার বের করে খাচ্ছেন। দুরুদুরু বুকে উঠলাম। গিটার নিয়ে গাইলাম 'তিন শতকের শহর/তিন শতকের বাঁধা/ সুতানুটির পারে নেমে এল সাহেবজাদা'। সতের বছর পর আবার গাইছি। আমার বয়স তখনই একচল্লিশ। স্নায়ুর ওপর এত চাপ যে গিটারটা ভাল করে বাজাতেও পারছি না। আশ্চর্য, এক নাম-না-জানা মাঝবয়সী লোকের গাওয়া সম্পূর্ণ অচেনা একটি গান দর্শকরা মন দিয়ে শুনতে শুরু করেছেন। সকলের করতালি আমায় সাহস দিচ্ছে। এরপর ছোট একটি কি বোর্ড বাজিয়ে গাইছি 'তোমাকে চাই'। কেউ শোনেনি আগে। ভিড় বাড়ছে। খাওয়া থেমে গিয়েছে। অসংখ্য মানুষ উৎকর্ণ। আরও করতালি। দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি শ্রোতারা স্তম্ভিত এই ধরনের গান শুনে। কিন্তু গানগুলি যে তাঁদের ভাল লাগছে সেটা তাঁরা নিজেরাই সম্যক বুঝছেন এবং তা জানিয়েও দিচ্ছেন। শেষ গান 'গড়িয়াহাটার মোড়'। আবার একটি অপরিচিত গান। লোকে লোকারণ্য হেমন্ত মঞ্চের সামনেটা। এমনকি পুলিস বাহিনীও গান শুনছে। তারপর যা ঘটল, তা অভূতপূর্ব। মানুষ আমায় আর ছাড়তে চাইল না। কিন্তু উদ্যোক্তাদের নির্ঘণ্টের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমায় নেমে যেতেই হল। মঞ্চ থেকে নেমে গেলাম এই হতচকিত বোধ ও উত্তেজনা নিয়ে যে বাংলা গানে একটি নতুন যুগ এসে পড়েছে। আমার ধারণা, দীর্ঘকাল পর আধুনিক বাংলা গানে নয়ের দশকে যে পরিবর্তন এল, তার প্রথম ঘোষণা হয়ে গেল ১৯৯০ সালের বসন্তে, কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে, কলকাতা উৎসবের 'হেমন্ত মঞ্চ'-এ। সে দিনের অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কারুর আর সেই মুহূর্তের কথা মনে পড়ে কিনা জানি না। স্মৃতি স্বল্পায়ু। কিন্তু আমার এই ধারণা ভ্রান্ত নয় যে কলকাতা উৎসবের ওই বিশেষ সন্ধেতেই আধুনিক বাংলা গানের একটি যুগমুহূর্ত সূচিত হয়ে গিয়েছিল। আমার আগে যে শিল্পীরা গাইছিলেন তাঁরা সকলেই প্রতিষ্ঠিত। সে-আসরে তাঁদের গাওয়া গানগুলিও ছিল সকলের মোটামুটি পরিচিত। অথচ শ্রোতাদের মধ্যে তেমন কোনও উৎসাহ দেখা যাচ্ছিল না। বসন্তের এক সন্ধেবেলা, সুষ্ঠুভাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রচলিত গান শুনে অবসর কাটানোর স্বাভাবিক ইচ্ছের বেশি কিছু দর্শকদের ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত এক গায়কের গলায় (গায়কটি আবার নিজেই একাধিক যন্ত্র বাজিয়ে গেয়ে চলেছে, সঙ্গে কোনও যন্ত্রশিল্পী নেই— এও এক নতুন দৃশ্য) কোনওদিন কোথাও না-শোনা তিনটি নতুন গান শুনে কয়েক হাজার প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যেভাবে উদ্বেল হয়ে উঠলেন, যেভাবে তাঁরা নতুন গানগুলিকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন, তা নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। আধুনিক বাংলা গানের বহমানতায় এক সন্ধিক্ষণ চিহ্নিত হয়ে গেল।

১৯৯১ সালে চিত্রপরিচালক তরুণ মজুমদারের 'অভিমানে অনুরাগে' ছবির জন্য একটি গান তৈরি করে গেয়ে-বাজিয়ে রেকর্ড করার সুযোগ পেয়েছিলাম তাঁরই বদান্যতায়। আমার কপাল চিরকালই খুব ভাল, সম্ভবত সেই কারণেই ছবিটি বেরতে পারেনি। আর ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে এইচ এম ভি বের করল 'তোমাকে চাই'।

১০

'তোমাকে চাই' অ্যালবামটি কিন্তু গানের বাজারে নাম করতে কয়েক মাস সময় লেগে গিয়েছিল। শুনেছি, প্রথম দিকে অ্যালবামটি মোটেও বিক্রি হয়নি। পরে হতে শুরু করেছিল। অ্যালবামটি প্রকাশ করার সময় এইচ এম ভি একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। তারপর আর নয়। 'তোমাকে চাই'-কে কেন্দ্র করে নানান নাটক হয়েছে সে সময়। কিন্তু সব চেয়ে নাটকীয় যে ঘটনা সেটি ওই অ্যালবামটি মানুষের কাছে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে। গানবাজনার রেকর্ড সারা পৃথিবীতেই সর্বযুগে জনগণের কাছে পৌঁছতে পেরেছে বেতারের মাধ্যমে। আমাদের দেশ তার ব্যতিক্রম নয়। বরাবর রীতিটি ছিল: রেকর্ড বেরবে, তারপর তা বেতার থেকে প্রচারিত হবে। বেতারে না বাজলে কোনও গানের রেকর্ড বৃহত্তর সমাজে প্রচারিত হওয়ার কোনও উপায়ই বলতে গেলে ছিল না। 'তোমাকে চাই' যখন বেরল, আকাশবাণীর এফ এম বেতারপ্রচার তখনও শুরু হয়নি। আকাশবাণীর মিডিয়াম ওয়েভ অনুষ্ঠানে মিউজিক ক্যাসেট বাজানোর নিয়ম ছিল না, রীতি ছিল শুধু গ্রামোফোন ডিস্ক বাজানোর। 'তোমাকে চাই' বেরিয়েছিল ডিস্ক হিসেবে নয়, ক্যাসেট হিসেবে। সুতরাং প্রকাশের সময় বা তার কয়েক বছরের মধ্যে এই অ্যালবামের কোনও গান আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয়নি। এত বড় একটা বাধা সত্ত্বেও গানগুলি সাধারণ শ্রোতাদের কাছে পৌঁছতে পেরেছিল শুধু মানুষে-মানুষে মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়া কথার জন্য। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন 'তোমাকে চাই'-এর একমাত্র বিজ্ঞাপন। তাঁদের উৎসাহই এই অ্যালবামটিকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল দিকে দিকে। এমন ঘটনা শুধু এ-দেশে কেন, পৃথিবীর কোনও দেশেই তার আগে ঘটেনি। বেতারের মতো প্রচারমাধ্যমের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া গানের একটা আস্ত অ্যালবাম অসংখ্য মানুষের ঘরে ও মনে পৌঁছতে পারে, সঙ্গীতের বাজারে (যে-বাজার তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ধুঁকছিল) বিক্রীর হুজুগ জাগিয়ে তুলতে পারে, পাইকারি ও খুচরো বিক্রেতাদের দোকানে দোকানে ফেলে দিতে পারে অদৃষ্টপূর্ব আলোড়ন— সমাজে ও সঙ্গীত ইন্ডাস্ট্রিতে এ এক সম্পূর্ণ নতুন যুগান্তকারী অভিজ্ঞতা।

'তোমাকে চাই' প্রকাশ, দেখতে দেখতে তার ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা ও গানের বাজারে তার বিপুল সাফল্য গবেষণার বিষয় হতে পারে। আমার ধারণা, এমন ঘটনা যদি পাশ্চাত্যে ঘটত, তা হলে সে গবেষণা এতদিনে হয়েও যেত।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক মানুষ অপরিচিত, সেই ভাবে দেখতে গেলে গানের দুনিয়ায় নবাগত (আমার প্রথম দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের গ্রামোফোন ডিস্ক বেরিয়েছিল ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে, মোটেও তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি সেগুলি, যদিও আকাশবাণী থেকে সেই রেকর্ড দুটি কালেভদ্রে বাজত) এক মধ্যবয়সী লোকের বাঁধা-গাওয়া গান যেভাবে কেতারের কোনও মধ্যস্থ-ভূমিকা ছাড়াই দলে দলে গ্রহণ করে নিলেন, তা থেকে যে-কারুর বুঝতে পারার কথা যে অর্থপূর্ণ, যুগোপযোগী আধুনিক বাংলা গানের অভাব তাঁরা সচেতনভাবে বা নিজেদের অজান্তেই বোধ করছিলেন। বিশেষ একটি মুহূর্তে মনের মতো কিছু গান পেয়ে তাঁরা আঁকড়ে ধরলেন সেই গানগুলি। 'তোমাকে চাই'-এর মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলা গানে একটি নতুন পরিসর তৈরি হয়ে গেল। অনেক বাঙালির মনে জেগে উঠল আধুনিক বাংলা গান সম্পর্কে নতুন প্রত্যাশা।

তার পরের বছর নচিকেতা চক্রবর্তীর প্রথম অ্যালবাম 'এই বেশ ভাল আছি' প্রকাশ করল এইচ এম ভি। প্রচ্ছদে লেখা হল 'জীবনমুখী বাংলা গান।' এই নামটি তার আগে কখনও শুনিনি। আমার অ্যালবামে অমন কোনও নাম ছাপা ছিল না। লেখা ছিল 'বাংলা গান'। পরে 'আধুনিক বাংলা গান' লেখা হতে থাকে। ওই সময় শুভেন্দু মাইতির বাংলা লোকসঙ্গীতের একটি অ্যালবামও বের করে এইচ এম ভি। তাতেও লেখা ছিল 'জীবনমুখী লোকসঙ্গীত'। কেউ যদি তাঁর স্বরচিত গানকে 'জীবনমুখী' আখ্যা দিতে চান তো তাতে কারুর আপত্তি থাকার কথা নয়। এ তো ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার। কিন্তু দেখা গেল, বাংলার সমাজে নতুন আধুনিক গানকে বড্ড বেশি লোক 'জীবনমুখী' নামে ডাকছে। নচিকেতা চক্রবর্তী তাঁর 'এই বেশ ভাল আছি' প্রকাশিত হওয়ার মুহূর্ত থেকে আমার চেয়ে অন্তত ঢের বেশি জনপ্রিয়। সম্ভবত সেই কারণেই এই অধমের গানগুলিকেও অসংখ্য মানুষ 'জীবনমুখী' বলতে শুরু করেছিলেন। পত্রপত্রিকার লেখায়, বেতার-টেলিভিশনের আলোচনায় আমাকেও 'জীবনমুখী' শ্রেণীতে ফেলে দেওয়া হতে থাকে। সঙ্গীতকে পেশা করার ব্যাপারে আমার পিতৃদেব আমার প্রথম-যৌবন থেকে যে হুঁশিয়ারি আমায় দিয়ে এসেছিলেন ('তোকে ছেলেবেলা থেকে এত যে গান শেখার ব্যবস্থা করে দিলাম সেটা তুই সঙ্গীতকে পেশা করবি বলে নয়, একদিন ভাল শ্রোতা হয়ে উঠবি বলে') তা ওই সময় থেকেই বারবার মনে হতে থাকে। বাবা মাঝে মাঝেই বলতেন, 'গানটাকে পেশা করিস না। দেখবি বড় কষ্ট পাবি। মানুষ তোকে বড্ড কষ্ট দেবে।' ১৯৯২ সালের পর থেকে ক্রমাগত বুঝতে পেরেছি কী সত্যি কথাই না বলেছিলেন তিনি।

নচিকেতা চক্রবর্তীর আত্মপ্রকাশের পর থেকে নানান পত্রিকায় শুরু হল দু'জনকে লড়িয়ে দেওয়ার খেলা। কেন জানি না, বাঙালি ও ভারতীয়রা এই ব্যাপারটা খুব পছন্দ করেন। সম্ভবত তাঁরা ভারী শান্তিপ্রিয় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ বলে। শক্তিশালী পারফর্মার, দক্ষ কণ্ঠের অধিকারী, চমৎকার হারমোনিয়ামবাদক নচিকেতা

চক্রবর্তী অতি অল্পকালের মধ্যেই অসংখ্য মানুষের মন জয় করে ফেললেন। তাঁর তৈরি গানগুলিও অনেকেরই খুব ভাল লাগতে শুরু করল। সঙ্গীতকার ও মঞ্চশিল্পী হিসেবে এ তাঁর বড় কৃতিত্ব। কালক্রমে তিনি অন্য কয়েকজন শিল্পীর জন্যেও গান রচনা করেছেন।

এক-সময়ে জোরাল সুকণ্ঠের অধিকারী এবং গণসঙ্গীত ও পল্লীসঙ্গীতের বিভিন্ন আঙ্গিকে অভ্যস্ত শুভেন্দু মাইতি নতুন ধারার বাংলা গানের পরিমণ্ডলে একটি বিশিষ্ট স্থান নেন ন'এর দশকে। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে। কারুর কাছে আমার কথা শুনে দেখা করতে এসেছিলেন তিনি। ঘরে বসে আমার গান শোনার পর বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে গিয়ে তিনি আমার গানের কথা বলেন। এইচ এম ভি'র নবপ্রতিভা-সন্ধান বিভাগের ম্যানেজার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। সত্যি বলতে, আমার গানগুলি রেকর্ড করার ব্যাপারে আমার তখনও বিশেষ উৎসাহ ছিল না। শুভেন্দু মাইতিই উৎসাহ দিতে থাকেন। বাংলা গান তিনি তার আগেই সম্ভবত রচনা করেছিলেন। কিন্তু ১৯৯০ সালের পর তিনি নিজেও যে গান তৈরির ব্যাপারে নতুন উদ্যম বোধ করেন তাতে সন্দেহ নেই। এর পর তিনি অনেক আধুনিক বাংলা গান রচনা করেন, তার মধ্যে একটি, 'মঈনুদ্দিন কেমন আছো', বেশ পরিচিতি লাভ করে। স্বরচিত গান তিনি অনুষ্ঠানে নিজেই গাইতেন। গণসঙ্গীতে ও লোকসঙ্গীতে দক্ষ শুভেন্দু মাইতির গায়কীতে দাপট ছিল। তাঁর সুরেও ওই দুই গোত্রের সঙ্গীতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গীতকার হিসেবে তাঁর যে ভূমিকা, সংগঠক, নতুন শিল্পীদের উৎসাহদাতা এবং বিভিন্ন মহলের মধ্যে যোগাযোগস্থাপনকারী হিসেবে তাঁর ভূমিকা তার চেয়ে বড়। শুনেছি নচিকেতা চক্রবর্তীর সঙ্গে এইচ এম ভি'র যোগাযোগও তিনিই ঘটিয়েছিলেন। তার পরেও বিভিন্ন তরুণ শিল্পী, গীতিকার ও সুরকারকে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন বলেই শুনেছি। গত এক দশকে শুভেন্দু মাইতি একাধিক গানের এলবাম করেছেন, তাতে তাঁর স্বরচিত গান স্থান পেয়েছে। ন'এর দশকে আমার রচনাগুলির ধাক্কায় নতুন বাংলা গান তৈরি ও পরিবেশন করার যে অদৃষ্টপূর্ব উদ্যম কলকাতায় দেখা যায় তার পরিমণ্ডলে শুভেন্দু মাইতির ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। অসম্ভব উদ্যোগী, গতিশীল ও আবেগপ্রবণ এই মানুষটি এক সময়ে নতুন ধারার বাংলা গান নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন।

১৯৯৩ সালে জ্ঞানমঞ্চে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে অঞ্জন দত্তর গান আমি প্রথম শোনার সুযোগ পাই। তাঁর ও তাঁর ছেলে নীলের সঙ্গীত পরিবেশনার আঙ্গিক আমায় মুগ্ধ করে। চমৎকৃত হই তাঁর কয়েকটি রচনা শুনে। মনে হয়েছিল নাগরিক চেতনা থেকে তিনি গান বাঁধছেন। তাঁর গানে ধরা দিচ্ছে তাঁর পরিবেশ, খুঁটিনাটি বিষয়, নানান চরিত্র, মানুষের নিঃসঙ্গতা, নাগরিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা, সেই সঙ্গে এক পরিশিলিত 'হিউমার' যা বাংলা গানে বিরল। নচিকেতা চক্রবর্তীর গানে ভারতীয় গানের ইডিয়ম বেশি পাচ্ছিলাম, আর অঞ্জনের গানে পাশ্চাত্যের

গানের। মনে হচ্ছিল গানবাজনায় তাঁদের ব্যক্তিত্ব আলাদা। অঞ্জন দত্তর ক্যাসেটেও 'জীবনমুখী' কথাটি কখনও ছিল না, তবু আমার মতো তিনিও জনমানসে 'জীবনমুখী' হয়ে ওঠেন। এই বিশেষণটি ঢালাওভাবে প্রয়োগ করে করে মানুষের মনে এটিকে পাকাপোক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে বাংলার মিডিয়া যে জোরালো ভূমিকা রেখেছে, তা অতুলনীয়। সাংবাদিক ও সমালোচকরা যদি এই ভুল ও মিথ্যে ব্যাপারটি নিয়ে হঠাৎ অত ব্যস্ত না হয়ে পড়ে গানগুলি একটু শুনতেন তো এর চেয়ে কম মেহনত হত তাঁদের। বেচারিরা!

অঞ্জন দত্তও বেশ তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বাংলা গানের আসর ও বাজার ততদিনে জমজমাট, সেই সঙ্গে মিডিয়ার কোনও কোনও মহলের এক অদ্ভুত বৈরী মনোভাব— যেন, নতুন বাংলা আধুনিক গান লিখে-সুর করে-গেয়ে কেউ কেউ মহাপাপ করে ফেলছেন। শুনেছি পশ্চিমবঙ্গের খুবই শক্তিশালী একাধিক ব্যক্তির উদ্যোগে 'সোনার বাংলা' নামে ভারী মনোগ্রাহী ও সত্যনিষ্ঠ একটি দৈনিক পত্রিকা বেরত। সেই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী সম্ভবত আমার প্রেমে পড়েছিলেন। কারণ আমার ব্যঙ্গচিত্র এবং আমার ও আমার গান সম্পর্কে দুর্দান্ত সব লেখা ছাপিয়ে ছাপিয়ে সেই পত্রিকার কর্ণধাররা একদিন এতই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন যে, অত ভাল পত্রিকাটি উঠেই গেল! আহা! আমার ও আমার গানের মুণ্ডপাত করার ফাঁকে ফাঁকে ওই পত্রিকাটি বেচারি অঞ্জন দত্তরও বন্দোবস্ত করতে শুরু করেছিল। শুনতে পেতাম শুধু আমাদের দু'জনের প্রেমেই তারা দিশাহারা। আর কারুর প্রতি তারা কৃপাদৃষ্টি দিতেন না, বরং প্রশস্তিই ছাপাতেন। আহা! বাঙালির নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে অত সুখপাঠ্য ও সত্যনিষ্ঠ একটি পত্রিকায় লালবাতি জ্বলল এক অশুভ প্রহরে।

খেয়াল করছিলাম, অনেকে যেমন মন দিয়ে নতুন নতুন গান শুনছেন, আরও অনেকে তেমনি গানবাজনা আদৌ শুনছেন না, তা নিয়ে কথা বলছেন ও লিখছেন বেশি। আগে লোকে গান শুনত বেশি, গান নিয়ে কথা বলত কম। নয়ের দশকের পর লোকে খুব কথা বলতে শুরু করল গান নিয়ে।

১৯৯০ সালেই আলাপ হয়েছিল মৌসুমি ভৌমিকের সঙ্গে। পরে তিনিও গান লিখতে, সুর করতে ও গাইতে শুরু করেন। কণ্ঠের এক পৃথক আবেদন, লেখা ও সুরের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য তাঁকে বিশেষ একটি জায়গা দিয়েছে। তাঁর প্রথম অ্যালবাম 'তুমি চিল হও' বেরোয় এইচ এম ভি থেকে। তার পরেও তিনি স্বরচিত গানের বিভিন্ন অ্যালবাম করেছেন। অনেক দিন তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে গান বেঁধে, গেয়ে চলেছেন। 'তুমি কোথায় ছিলে অনন্য' মৌসুমি ভৌমিকের স্মরণীয় একটি গান।

আধুনিক বাংলা গানের আসরে গান-কারিগর ও কণ্ঠশিল্পী হিসেবে মৌসুমি ভৌমিকের আগমনের ঠিক পরেই সম্ভবত কাজি কামাল নাসের এলেন। চমৎকার লিরিক লেখার ক্ষমতা তাঁর। বাংলা গানের সনাতন কিসিম তিনি ভাল বোঝেন।

বাংলা গান গাওয়ার অভ্যেসও তাঁর আগে থেকেই ছিল। মননশীল, রুচিবান কাজি কামাল নাসের এক দশকের ওপর বিভিন্ন ধরনের বাংলা আধুনিক গান তৈরি করে এসেছেন, করে নিতে পেরেছেন নিজের একটি জায়গা। যন্ত্রসঙ্গীত-আবহ রচনাতেও তিনি দক্ষ। তাঁকে 'প্রফেশনাল' গীতিকার-সুরকার বলা যায়। একাধিক কোম্পানির লেবেলে তাঁর তৈরি গান নানান শিল্পী গেয়েছেন। আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকারও হয়ে উঠেছেন তিনি এক সময়ে। তাঁর নানান রচনার মধ্যে 'একটা অন্য রকম গান' ও 'মেঘলা মেঘলা দিনে' নয়ের দশকে আধুনিক বাংলা গানের সম্ভারে নিঃসন্দেহে দুটি স্মরণীয় অবদান।

নয়ের দশকের গান-কারিগরদের মধ্যে কাজি নাসেরের রচনায় আধুনিক বাংলা গানের সনাতন আদল খুব স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছিল। একমাত্র তাঁর গানেই সঞ্চারী-চিন্তা দেখা দিয়েছে মাঝেমাঝে। শুধু তাই নয়, বাংলা পল্লীগীতির সুরের প্রভাবও এড়িয়ে যাননি তিনি। এই একটি জায়গায় নয়ের দশকের নতুন বাংলা গান (গান-কারিগরদের গান) আধুনিক বাংলা গানের ধারার থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। বাংলার পল্লীসঙ্গীতের সুর-ছন্দ-কিসিমের প্রভাব যেন এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছিল ওই সময়ের অনেক গান। আমার গানে ওই প্রভাব বরাবরই অল্পবিস্তর পড়েছে, কাজি কামাল নাসেরের গানেও। কিন্তু তার বাইরে প্রভাবটি প্রায় নেই। এটা লক্ষণীয়, কারণ পল্লীগীতির সুর-ছন্দ-কিসিম এড়িয়ে আধুনিক বাংলা গান তৈরির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা কঠিন, তা অযৌক্তিকও। বাংলার মানুষ হলে, বাংলা গানের আবহে বড় হয়ে উঠলে কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া ইত্যাদির প্রভাবে আদৌ না থাকাটা আমার কাছে অন্তত একটু অদ্ভুত লাগে। আধুনিক বাংলা গানের যে সব রূপ আমরা দীর্ঘকাল ধরে পেয়েছি, তা থেকে বাংলার পল্লীগীতির স্পর্শ বাদ পড়েনি। নয়ের দশক থেকে যাঁরা আধুনিক বাংলা গানের সুরকার হয়ে উঠলেন, তাঁদের বেশিরভাগই কি তা হলে আধুনিক বাংলা গানের ঐতিহ্যময় ইডিয়মগুলি থেকে সাঙ্গীতিকভাবে দূরে? আধুনিক বাংলা গানের সুরে পল্লীসঙ্গীতের সুর ও আঙ্গিক চিরকালই সূক্ষ্মভাবে মিশেছিল। সেই সূক্ষ্ম উপস্থিতিটাই যেন লোপ পেতে লাগল। সঙ্গীত রচনা, সুর দেওয়া এক গভীর মনস্তত্ত্বের বিষয়। দীর্ঘকালের সঙ্গীতস্মৃতি সুর রচনার প্রক্রিয়ায় মাঝে মাঝেই ধরা দেয়। কোনও সুরকারের একাধিক সুর শুনেই একজন বোদ্ধা ব্যক্তি মোটের ওপর আন্দাজ করে নিতে পারেন, তিনি কী ধরনের গান ও বাজনা শুনেছেন এবং কতটা। নয়ের দশক থেকে যাঁরা বাংলা গানের সুরকার হিসেবে এলেন, তাঁদের অনেকের সুর ও আঙ্গিক শুনে পরিশীলিত শ্রোতাদের বুঝে নেওয়ার কথা এঁদের বেশিরভাগ কী ধরনের গানবাজনা শুনে অভ্যস্ত।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় একবার আমায় বলেন, তাঁর গুরু ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খান সাহেব তাঁকে বলেছিলেন, সঙ্গীত শিক্ষার শতকরা আশি ভাগই হল শোনা। গুরুর কাছে তালিমের ভাগ কুড়ি। নয়ের দশক থেকে যে আধুনিক বাংলা

গান শোনা যেতে লাগল, তার সুর-তাল-ছন্দ-আঙ্গিক ওই যুগপুরুষের উক্তির আওতায় বিচার করলে বোঝা যেতে বাধ্য, পশ্চিমবঙ্গের সাতের দশকের সুরকাররা যা যা শুনতেন, নয়-পরবর্তী সুরকাররা সম্ভবত সেগুলি আর ততটা শোনেননি। এর ফলে নতুন বাংলা গানের সুর-তালের জগতে একটা লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটে গেল। আধুনিক বাংলা গান ক্রমশই তার মোকাম হারিয়ে ফেলতে লাগল।

তালের ক্ষেত্রে, এমনিতেই বাংলার আধুনিক গানে বরাবরই ছয় ও আট মাত্রার প্রাধান্য। কিন্তু তিন থেকে ছয়ের দশক পর্যন্ত নানান সুরকারের রচনায় সাত মাত্রা ও দশ মাত্রাও কখনও কখনও পাওয়া গিয়েছে। সাতের দশকে এই ব্যাপারটি কমতে থাকে। নয়ের সুরকারদের মধ্যে ক'জন দাদরা, ডবল দাদরা, কাহারবা, অর্থাৎ সেই ছয় ও আট মাত্রার বাইরে গিয়ে অন্য কোনও তালে সুর করেছেন, গান বেঁধেছেন? তাল-ফেবতাও বলতে গেলে মিলিয়ে গিয়েছে। এখানেও সেই শোনার অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গটি এসে পড়তে বাধ্য।

শিলাজিৎ ও পল্লব কীর্তনীয়াও জনসমক্ষে আসেন ও নাম করেন নয়ের দশকেই। দু'জনেই গান লিখেছেন, সুর করেছেন, গেয়েছেন। কিন্তু দু'জনের বৈশিষ্ট্য আলাদা। শিলাজিতের রচনা শুনলে মনে হতে চায় না যে তিনি আধুনিক বাংলা গানের ধারার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে আগ্রহী। আর পল্লব কীর্তনীয়ার কিছু কিছু গান অন্তত সেই ধারা থেকে দূরে নয়। আমার এ-ও মনে হয়েছে যে পল্লব কীর্তনীয়ার গান-চিন্তায় রাজনৈতিক মতবাদের ভূমিকা বেশি।

১১

রাজনৈতিক মতবাদ ও বক্তব্যের কথা উঠলে যাঁর কথা বাংলা গানের আলোচনায় কিছুতেই বাদ দেওয়ার জো নেই, তিনি প্রতুল মুখোপাধ্যায়। নয়ের দশকের বেশ আগে থেকেই তিনি গণসঙ্গীতের আসরে ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর তৈরি গান আমি অন্তত একাধিক গণসঙ্গীতশিল্পীর কাছে আটের দশকের মাঝামাঝিই শুনেছি। কিন্তু নয়ের দশকে তিনি অনেক বেশি খ্যাতি অর্জন করেন। ওই দশকে বাংলা গান পরিবেশন করা ও শোনার যে জোয়ার এসেছিল, তাতে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠান ও গানও ছিল সামিল। পরিবেশনায় তাঁর আঙ্গিক সম্পূর্ণ নিজস্ব। এক সময় তাঁর সঙ্গে যন্ত্র বাজলেও নয়ের দশকে তিনি খালি গলাতেই মঞ্চে গাইতে লাগলেন। সুরকার হিসেবে তিনি রীতিমতো বিশিষ্ট। অরুণ মিত্রসমেত বিভিন্ন কবির কবিতায় তিনি উল্লেখযোগ্য দক্ষতার সঙ্গে সুর দিয়েছেন। বস্তুত, এতক্ষণ যে শিল্পীদের কথা বললাম, তাঁদের মধ্যে স্রেফ সুরকার হিসেবেই প্রতুল মুখোপাধ্যায় হয়ত সবচেয়ে বিশিষ্ট, পৃথক। উল্লেখ করা দরকার, তাঁর সুরে বাংলার পল্লীসঙ্গীতের সুর ও কিসিম যেমন পাওয়া যায়, তেমনি মেলে হিন্দুস্থানি রাগসঙ্গীতের ছোঁয়া। শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা'য় সুর দিতে গিয়ে তিনি যেমন তোড়ি রাগ প্রয়োগ করেছেন সুকৌশলে, তেমনি তাঁর জনপ্রিয় গান 'ডিঙা ভাসাও' বয়ে নিয়ে চলেছে লোকগীতির আবেদন। স্থায়ী ও অন্তরার সুর রচনায় প্রতুল মুখোপাধ্যায় থেকে থেকেই যে মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন, তা প্রমাণ করে দেয় তাঁর গানবাজনা শোনার অভিজ্ঞতা কী ধরনের ও কতটা। এখানে ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলির উক্তিটি আবার স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর 'স্লোগান দিতে গিয়ে' গানটির সুর বাংলার আধুনিক গানের প্রতিষ্ঠিত ইডিয়মের প্রয়োগে যতটা আকর্ষণীয়, ততটাই তা চমকপ্রদ 'স্লোগান' কথাটি তিনি যেভাবে হঠাৎ নিচের সপ্তকে পুনরাবৃত্ত করেছেন সে জন্য। তেমনি তিনি এমন সুরও দিয়েছেন যা বৈপ্লবিকরকম নিরীক্ষানিষ্ঠ। 'একটি বালক' হয়ত তার সবচেয়ে জোরালো উদাহরণ। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সুর শুনলেই সুররসিক মানুষের বুঝে নেওয়ার কথা যে এই সুরকার গানের লিরিকে সুর প্রয়োগ নিয়ে রীতিমতো মাথা ঘামান। একই রকম সুর তাঁর ধাতে সয় না। তেমনি, গত অন্তত তিনটি দশকে পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা গানে বা কবিতায় সুর দিয়েছেন, প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে তাঁদের মধ্যে অন্যতম নিরীক্ষামনস্ক বলতে আমার একটুও দ্বিধা নেই। আমার অনুভব, কথা বা মতবাদ

নয়, সঙ্গীতের নিরিখে বাংলা গানের ইতিহাস যদি কখনও লেখা হয় এবং লেখক যদি বাংলা গানের নিষ্ঠাবান শ্রোতা হন তো সুরকার হিসেবে প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে তিনি বিশেষ একটি আসন দেবেন। আমি লক্ষ্য করেছি, প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের অনেক শ্রোতা তাঁর গান শোনেন প্রধানত রাজনৈতিক মতবাদের কারণে। সুরকার ও গীতিকার হিসেবে (সেইভাবে বলতে গেলে সঙ্গীতের মাপকাঠিতে) তাঁর গানের বিচার কারা করেন ঠিক জানি না। তাঁর সুর দেওয়া 'ও ছোকরা চাঁদ' গানটি উপযুক্ত যন্ত্রানুষঙ্গে পরিবেশিত হলে সঙ্গীতময় আবেদনের দিক দিয়ে উপমহাদেশের প্রথম সারির গানগুলির সঙ্গে দিব্যি পাল্লা দিতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। সঙ্গীতের আলোচনা সঙ্গীতের নিরিখেই হওয়া দরকার। সেখানে মতবাদগত কারণে কে কী বিশ্বাস করেন, কোন শিবিরের আওতায় কোন মত ব্যক্ত করেন তা সঙ্গীতের লোকের কাছে সম্পূর্ণ অবান্তর। ঠিক যেমন, ধরা যাক, মুক্তিযুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধ বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করতে পারেন ও করে থাকেন যাঁরা, নানা ধরনের যুদ্ধাস্ত্র, অস্ত্র বানিয়ে নেওয়ার কৌশল, অস্ত্র হাতে বা ঠেকায় পড়লে অস্ত্র ছাড়াই অতি প্রতিকূল অবস্থায় লড়াই করার অথবা নিজেকে বাঁচানোর অভিজ্ঞতা, গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জ্ঞান তাঁদের না থাকলে এগুলি নিয়ে মত না দেওয়াই ভাল।

সমীর চট্টোপাধ্যায়ও নিজে গান লেখার পাশাপাশি কবিতাতেও সুর করেছেন। নয়ের দশকে তাঁর সুরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে প্রধানত লোপামুদ্রা মিত্রর গাওয়া গানের অ্যালবামের মধ্যে দিয়ে। তাঁরও প্রথম অ্যালবাম এইচ এম ভি-ই প্রকাশ করেছিল। সমীর চট্টোপাধ্যায় নিজে সেতারশিল্পী, তাই রাগসঙ্গীতের কাছাকাছি তিনি। আধুনিক বাংলা গানের ধারাবাহিকতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বাংলার পল্লীগীতির সুরের আবহেও থেকেছে তাঁর রচনা। 'হেই গো মা দুর্গা' যেমন, বাংলা ঢোলের তালে বাঁধা। তাল ও ছন্দের প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট আলাদা। তাঁর একটি শ্রুতিসুখকর গান 'বাইরে খুব মেঘ করেছে' সাত মাত্রায়। তেমনি জয় গোস্বামীর 'রেণীমাধব' কবিতাটিতে এমনিতেই পাঁচ বা অন্যভাবে দেখলে দশ মাত্রার যে চলন রয়েছে, এই কবিতায় সুর দিতে গিয়ে সমীর চট্টোপাধ্যায় তা লঙ্ঘন করেননি। গানটিও হয়ে উঠেছে একই মাত্রাসমষ্টিতে। নয়ের দশকের সুরকারদের মধ্যে সমীর চট্টোপাধ্যায় এই ধরনের একাধিক দিক দিয়ে একটু আলাদা। একই সঙ্গে তিনি বাংলা আধুনিক গানের ধারাবাহিকতার অংশীদার, আবার নিজস্ব সঙ্গীতভাবনা ও সঙ্গীতপ্রয়োগে তিনি নিরীক্ষাপ্রবণ।

স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তও নয়ের দশকেই গীতিকার, সুরকার ও গায়িকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী হিসেবেই তিনি বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন কালক্রমে।

দুই ভাই, ময়ূখ ও মৈনাক, নয়ের দশকে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় এসে বাংলা আধুনিক গান তৈরির কাজে হাত দেন। তাঁরাই সেই গানগুলি গাইতেন।

এঁদের কাজে উত্তরবঙ্গের সুরের ছোঁয়া পাওয়া গেল, পাওয়া গেল অনুচ্চ, মিঠে একটি মেজাজ। লিরিকেও এঁরা সেই অনুচ্চ গ্রাম বজায় রাখলেন। এঁদের গান শুনে মনে হচ্ছিল আধুনিক বাংলা গানের বহমান ধারায় থেকেই তাঁরা তাঁদের সুর-তাল প্রয়োগের স্বকীয়তার ছাপ রাখতে চান, লিখতে চান উপযুক্ত লিরিক। এঁরা আজও কাজ করে যাচ্ছেন, চেষ্টা করছেন আজকের প্রতিকূল পরিবেশেও কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে। সেটা করতে গিয়ে তাঁরা পরিশীলন ও একটা মানসিক-সাঙ্গীতিক মাপ বর্জন করছেন না।

এতক্ষণ যাঁদের কথা লিখলাম তাঁরা গ্রামোফোন ডিস্ক নয় মিউজিক ক্যাসেটের যুগের মানুষ। প্রযুক্তির বিবর্তনের কারণে তাঁরা সকলেই এমন একটা যুগে নতুন গান বাঁধা ও গাওয়ার চেষ্টা করেছেন যখন একবারে দুটি বা বড়জোর চারটি নয় অন্তত আটটি দশটি গান দিয়ে ক্যাসেট ভরতেই হবে। এই দায় তিন থেকে সাতের দশকের গোড়া অবধি বাংলার সঙ্গীতকারদের ছিল না। থাকলে তাঁরা কী করতেন কে জানে। সারা বছর খেটেখুটে, ভাবনাচিন্তা করে, বাছাই করে দুটি চারটি গান তৈরি করা আর বছরে আটটি দশটি করে গান তৈরি করতে বাধ্য হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। সত্যি বলতে, ন'এর দশকে নতুন বাংলা গানের জগতে যাঁদের আগমন, তাঁরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সেই ছ'এর দশকের পাশ্চাত্যের গানের সংরাইটারদের কাছাকাছি—নিজেরাই গান তৈরি করছেন, নিজেরাই গাইছেন। তফাৎ শুধু মোক্ষম একটি জায়গায় : পাশ্চাত্যের সংরাইটাররা নিয়মিত গান বেঁধে ও গেয়ে তারপর নাম করেছিলেন, রেকর্ড করার সুযোগ পেয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের এই নতুন ব্যক্তিদের মধ্যে খুব কম মানুষই ন'এর দশকের আগে নিয়মিত গান রচনা করেছেন। গান লেখা ও সুর করার প্রশিক্ষণ ও অভ্যেস অনেকেরই ছিল না। তেমনি, আমার তৈরি গান আমি কোন আঙ্গিকে গাইব তারও একটা অভ্যেসের প্রক্রিয়া আছে। সেটিও ছিল বেশিরভাগের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। ফলে, নির্মোহ হয়ে ভেবে দেখলে আমরা বলতে বাধ্য যে একলাগাড়ে গান বেঁধে গাইতে গিয়ে অনেকেই আশানুরূপ কাজ শোনাতে পারেননি কারণ সেই প্রস্তুতিই তাঁদের ছিল না। অনেক কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছে কাঁচা হাতের, কাঁচা গলার কাজ। এ ছাড়াও তিন থেকে সাতের দশকের মধ্যে আধুনিক বাংলা গানের জগতে (শিল্পসংস্কৃতির সব জগতেই এটা হতে বাধ্য যদি তা আধুনিক ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার অমোঘ পৌনঃপুনিকতায় সামিল হয়ে যায়) যে সর্বনেশে মধ্যমান কায়েম হয়ে গিয়েছিল তা নতুন বাংলা গানের পরিবেশেও চারিয়ে গেল, কারণ মধ্যমানের থেকে উন্নত মানের শিল্পসৃষ্টি সমানে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই ক্ষমতা জগতে এত কম মানুষের মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সেটা নেহাতই ব্যতিক্রম। নতুন বাংলা গানের ক্ষেত্রে দেখা গেল আর-এক বাড়তি বৈশিষ্ট্য যা বিপজ্জনক : প্রফেসনাল জগতে যে কোন ক্ষেত্রে যে ন্যূনতম মান বজায় না রাখলেই নয়, সেই মান আর বজায় থাকল না। সাতের দশকের গোড়া পর্যন্ত

আধুনিক বাংলা গান কথা-সুর যন্ত্রণুবঙ্গ মিলিয়ে সার্বিক বক্তব্যের দিক দিয়ে যুগোপযোগী না হয়ে উঠতে পারলেও স্বীকৃত লঘু সঙ্গীতের ন্যূনতম মান যা হোক করে হলেও বজায় থাকত। তার একটা কারণ, প্রথাগত আধুনিক গান কিভাবে লিখতে হয় (যদিও তার অনেকটাই ছিল বিরক্তিকররকম একঘেয়ে, কল্পনাশক্তিহীন, অনাধুনিক) এবং সেই কথায় কিভাবে সুর দিতে হয়, সেই যুগের গীতিকার-সুরকাররা তা জানতেন। আকাশবাণী ও গ্রামোফোন কম্পানিগুলির কষ্টিপাথরে তাঁদের ন্যূনতম যোগ্যতা যাচাই করা হত। তেমনি গায়ক-গায়িকারাও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবেই আসতে পারতেন গানের ইন্ডাস্ট্রিতে, গানের জগতে। ক্যাসেটের যুগে সেসব বালাই আর না থাকায় অযোগ্য মানুষের অনধিকারচর্চার সুযোগ এসে পড়ল। গান লেখা, সুর করা ও গাওয়া যদি অতই সহজ হত তাহলে তো কথাই ছিল না। সারা পৃথিবীর গানের জগতে তাহলে অনেককাল আগেই দেখা দিত মাথামুণ্ডুহীন অরাজকতা। সেই অরাজকতার যুগ শুরু হয়ে গেল ন'এর দশক থেকে পুরোপুরি। শ্রোতারা এবং মিডিয়াও নিরঙ্কুশভাবে সবই শুনতে লাগলেন, সবাইকেই গ্রাহ্য করতে লাগলেন। আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনহীন, স্বঘোষিত বা বন্ধুমহল এমনকি রাজনৈতিক দল-ঘোষিত 'শিল্পীর' সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় যে অবস্থা অচিরেই দাঁড়াল তা হাস্যকর ও বিরক্তিকর। কয়েক বছর এইভাবে চলায়, আধুনিক সঙ্গীতের ভালমন্দ বিচারের ক্ষেত্রে আর কোন মাপকাঠিই রইল না। তাছাড়া, একটি ক্যাসেটে আট দশটি গান থাকলে এবং সমানে অসংখ্য ক্যাসেট বেরতে থাকলে ক'জন শ্রোতাই বা একটি ক্যাসেটের সবকটি গান মন দিয়ে শুনবেন? আগে গ্রামোফোন ডিস্কে দুটি বা চারটি গান থাকত। বেশি ডিস্কও বেরত না। লোক তবু মন দিয়ে শোনার অবকাশ পেত—তা-সে যার ডিস্কই হোক। ক্যাসেটের নবযুগে শ্রোতারাও পড়লেন ঘোর বিপদে। ক্যাসেটযুগের এই বৈশিষ্টের কারণে কোন কোন ক্যাসেটের অনেক গান লোকে আদৌ শোনেনি বা শুনলেও মন দিয়ে শুনে উঠতে পারেনি। গানবাজনা শোনা ছাড়াও মানুষের তো অন্যকাজও আছে। অত গান আর অত ক্যাসেট বেরলে মানুষ দিশেহারা বোধ করতে বাধ্য। তা থেকেই এক-সময়ে দেখা দেয় নিস্পৃহতা। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে যা যা বললাম তা বাংলাদেশের গানবাজনার জগতেও ঘটেছে। দুই বাংলাতে আজও এই অবস্থাই বর্তমান।

ন'এর দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গে 'আমোও পারি আমোও পারি' ধারণা থেকে এত মানুষ গান লিখে সুর করে গেয়ে বাজার মাত করার সংকল্প নিয়ে ফেললেন যে চারদিকে এক অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হল।

বাজারে নাম করে যাওয়া কোনও কোনও নতুন গান-বাঁধা-গায়কের সৃষ্টির ধাক্কায় এবং মিডিয়ায় তাঁদের সম্পর্কে তারিফমিশ্রিত উল্লেখে অনুপ্রাণিত অনেক বঙ্গসন্তান যেসব গান উপহার দিতে শুরু করলেন, সেগুলি শুনে সুস্থ মস্তিষ্কের যে কোনও শ্রোতার মনে হওয়ার কথা— শুধু বাংলা গান কেন, কোনও স্বাভাবিক

গানের সঙ্গেই এঁদের কোনও যোগ নেই। এঁরা এবং নাম করে যাওয়া কেউ কেউ গানবাজনা আদৌ শেখেননি। লেখার ক্ষমতা এঁদের অনেকেরই হয় একেবারেই নেই, অথবা থাকলেও তা নিতান্তই সীমিত। সুর বলতে এঁরা যে ঠিক কী বোঝেন, তাও আন্দাজ করা দুষ্কর।

সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু'তে একটি গল্প আছে কবিতা লেখা নিয়ে। একটি স্কুলে এক নতুন ছাত্র এল যে 'পোয়েট্রি' লেখে। কিছুদিনের মধ্যেই অন্যরাও তার দেখাদেখি কবিতা লেখা ধরল। তার একটির নমুনা : 'আহা যদি থাকত তোমার ল্যাজের ওপর ডানা/উড়ে গেলেই আপদ যেত করত না কেউ মানা।' শেষ পর্যন্ত কাব্যব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ল স্কুলের প্রায় সব ছাত্রই। একদিন ইনস্পেক্টর এলেন স্কুল পরিদর্শনে। সকলে অপেক্ষা করছিল জুতসই একটা সুযোগের জন্য। ভদ্রলোকের সামনে কাব্য-বাহাদুরি দেখাতে একজন তার পকেট থেকে পদ্য লেখা একটা কাগজ বের করতেই, বাকি সকলেও যে যার পদ্য বের করে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল। একটি বেড়াল ওপরের তলার কার্নিশে দিবানিদ্রামগ্ন ছিলেন। সমবেত কিশোরকণ্ঠে বঙ্গকাব্যের ও হেন বিদঘুটে হট্টগোলে তিনি বিষমটিবম খেয়ে ছিটকে পড়লেন নিচে।

নয়ের দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গে গান লেখা-গাওয়া নিয়ে যা শুরু হল, তাতে একমাত্র মহাকবি, মহাপ্রাজ্ঞ সুকুমার রায়ের ওই গল্পটি ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ার কথা নয়। কালক্রমে ওই গল্পটিরই অকৃত্রিম পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নবগানের গনগনে আঁচে। সকলেই দেখা গেল ও দেখা যাচ্ছে সব কিছু জানে, পারে। এ জন্য কাউকে সঙ্গীত শিখতে হয় না বিশেষ। লেখার ব্যাপারটা তো নয়ই। সুর? ওটা কোনও ব্যাপারই নয়। পশ্চিমবঙ্গ ও প্রতিবেশী বাংলাদেশের অসংখ্য অনুপ্রাণিত গানযোদ্ধা এই বিশ্বাসগুলিকে হাতিয়ার করে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন ভবিষ্যতের দিকে। মাঝেমাঝেই কানে আসে আমিই নাকি বাংলা গানের এ হেন যুগ পরিবর্তনের মূলে। শুনে, কখনও মনে হয় আমি মহাকবি সুকুমারের গল্পের সেই নতুন পড়ুয়াটি, যে 'পোয়েট্রি' লিখত এবং যার দেখাদেখি অন্য পড়ুয়ারাও পদ্য লিখতে শুরু করে। কখনও আবার মনে হয় আমি ওই গল্পের বেড়ালটা, নববঙ্গকাব্যনিনাদের আকস্মিকতায় যিনি ভয়ানক বিষম খেয়ে কয়েক তলা ওপর থেকে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে নিচে পড়ে যাচ্ছেন। আমার অনুমান, বাংলার আরও অনেক মানুষ এখন বাংলা গানের চোটে ওই বেড়ালটির দশা প্রাপ্ত হয়েছেন।

তারই মাঝখানে হঠাৎ দু'একটি সুস্থ গান যে শোনা যায়নি তা নয়। কিন্তু ঝাড়ের মতো প্রকাশিত নতুন গানের সংখ্যার অনুপাতে তা কিছুই নয়। অনুপাতের কথা উঠলই যখন, তখন বলতেই হয় নয়ের দশকেই কলকাতার শিল্পীদের মধ্যে ও ইন্ডাস্ট্রিতে 'রিমেক' প্লাবন শুরু হওয়ায় মিডিয়া 'রিমেক' বনাম 'নতুন গান'-এর (মিডিয়া অবশ্য ইচ্ছে করেই অযৌক্তিকভাবে 'জীবনমুখী' বলত, নতুন গান

বলত না) কাজিয়া লাগানোর মহৎ উদ্যোগ শুরু করে দিয়ে যে অনুপাতবোধের পরিচয় দেয় তার কথা। শ্রোতাদের মধ্যেও শুরু হয়ে যায় বিভাজন। একমাত্র শ্রীকান্ত আচার্য বাদে সে মুহূর্তে খ্যাতি অর্জন করা আধুনিক গানের আর কোনও শিল্পী নতুন গানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি বোধহয়। সঙ্গীতরসিক, সুগায়ক শ্রীকান্ত আচার্য তাঁর পরিশীলিত মনেরই পরিচয় দিয়েছেন এ প্রসঙ্গে। 'চলতি হাওয়ার পন্থী' হতে চাওয়া দোষের কিছু হবে কেন? নতুন গানের পাশাপাশি 'রিমেক' গানের বাজার তৈরি হয়ে যাওয়ায় কোনও শিল্পী সেই ধরনের গান করতেই পারেন। তাতে তাঁর কোম্পানির যদি লাভ হয় তো সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তা ভালই। সমস্যা দেখা দিতে পারে যখন 'রিমেক' গানের একক মহিমাকীর্তন করতে গিয়ে কেউ নতুন গান ও তার সব শিল্পীর প্রতি কটাক্ষ করতে শুরু করেন। মিডিয়ার এক অংশের সৌজন্যে সেটাই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই তালে দু'একজন 'রিমেক-তারকা' তাল মেলাতে ভোলেননি সে সময়ে। কালক্রমে দেখা গেল 'রিমেক' গান কিছুটা সময় ধরে ভাল ব্যবসা দিলেও, তার আবেদন কমছে। অর্থাৎ নতুন ধারার বাংলা গান এবং 'রিমেক' কোনওটাই আর হালে সেই প্রথম দিকের পানি পাচ্ছে না।

নতুন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল আগে বলেছিলেন, নব সৃষ্টির যত দোষই থাক, মুক্তি সেই কাঁটা পথেই। সাবেক সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি সম্পর্কেও বলেছিলেন তিনি মোক্ষম : অজন্তা ইলোরার ছবি ভাল, তাই বলে কি বাকি জীবনে আমরা তার ওপর দাগা বুলিয়ে কাটিয়ে দেব? এমনিতে সারাক্ষণ রবীন্দ্রনাথ আওড়ানো 'শিক্ষিত' বাঙালিরা নতুন ধারার বাংলা গান এবং সাবেক গানের মাহাত্ম্য বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা ও বক্তব্য রাখার সময় রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি মনে রাখেন না। রাখলে আসলে বিপদ, তা হলেই আর একপেশে হওয়া যায় না।

নতুন কোনও জিনিস, বিশেষ করে গানবাজনার মতো বিনোদনমূলক জিনিসে নতুনত্ব এলে অনেকেই উৎসাহিত বোধ করেন। বাংলার শ্রোতারা কয়েক বছর সেই উৎসাহ দেখিয়েছেন, পয়সা খরচ করে একের পর এক অনুষ্ঠানে গেছেন, ক্যাসেটের পর ক্যাসেট কিনেছেন। ১৯৯২ পরবর্তী গণ-উৎসাহ স্বাভাবিকভাবেই স্তিমিত হয়ে এসেছে কয়েক বছর পর। সত্যি বলতে, নতুন শিল্পীরাও বাংলার জনগণের প্রশ্রয় ও সমর্থনের প্রতি ধারাবাহিকভাবে সুবিচার করতে পারেননি। নাগাড়ে আট-দশটা গান বেঁধে গেয়ে ক্যাসেটবন্দী করে যাওয়া আর অনুষ্ঠানের প্রাবল্য— দুটোই ধারাবাহিকভাবে, উৎকর্ষ বজায় রেখে চালিয়ে যাওয়া খুবই দুষ্কর। অতি-উৎপাদন, অতি-বিপণন আর অতি-পরিবেশন সর্বনাশ ডেকে এনেছে বাংলা গানের, সমানে ডেকে আনছে। ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা এমনকি (সন্দেহ হয়) স্পৃহাও হারিয়ে ফেলেছেন অনেকে এই অতি-সব কিছুর পরিণামে। এসে পড়েছে অবসাদ ও একঘেয়েমি। একই ধরনের একঘেয়েমি 'তোমাকে চাই'

প্রকাশের আগে আধুনিক বাংলা গানের জগতে বিরাজ করছিল।

আমি কোনটা কতটা জানি, বাস্তবিকই করতে পারি, আমার সীমাবদ্ধতা কোথায়, কোথায় আমার ক্ষমতা, কোন ক্ষেত্রে আমি অক্ষম— এই সব দিকে মানুষ যদি নিরঙ্কুশ সততা নিয়ে নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে না পারে তো তার জীবনে অনেক কিছু গুলিয়ে যেতে বাধ্য। কোথাও তার একটু ক্ষমতা থাকলেও অচিরেই তা অপব্যবহার ও বোধের অভাবহেতু নষ্টও হয়ে যেতে পারে। এই ব্যাপারগুলি শিল্প-সাহিত্য-নাটক-চলচ্চিত্রের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো আধুনিক বাংলা গানেও বেদনাদায়ক ও বিরক্তিকর পরিণাম ডেকে এনেছে। একক শিল্পীদের গানের পাশাপাশি বাংলা ব্যান্ডের যুগ শুরু হওয়ার পর তরুণ সমাজে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যান্ডধারার ওপরেও নতুন ধারার বাংলা গানের ক্ষেত্রে উৎকর্ষের ধারাবাহিকতা ও সৃজনশীলতার যে অভাব ও নানান মৌলিক দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছিল, সেগুলিই ক্রমান্বয়ে বর্তেছে। এখনও বর্তাচ্ছে সমানে। উপযুক্ত তালিম, শিক্ষা, দক্ষতা ও প্রতিভা ছাড়া সৃজনশীল কাজ করা ও চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। আজ বিশ্বায়ন, মৌলিক পণ্যায়ন এবং নানান পণ্যের বিক্রয়মুখী বিজ্ঞাপন প্রচার-অভিযানে বাংলা রক ব্যান্ড ও তার শিল্পীদের যে শ্রেষ্ঠীরা সমানে কাজে লাগাচ্ছে, তারা আর যাই হোক, সঙ্গীতের ভাল চায় না। সঙ্গীত নিয়ে তারা চিন্তিতই নয়। তেমনি ইলেকট্রনিক মিডিয়াও তাদের চব্বিশ ঘণ্টার খাঁই মেটাতে নানান ধরনের গানবাজনাকে যে ব্যবহার করছে, তার কোথাও রসবোধ, মন্দকে বর্জন করে ভালকে মদত দেওয়া, পরিমিতি বজায় রাখার কোনও অভিলাষ নেই। আজ এটা চলছে, অতএব এটাই চালিয়ে যাও। এই হল দর্শন। এর ফলে আবার সেই সব কিছু গুলিয়ে যাওয়া, জট পাকিয়ে যাওয়া, এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া যেখানে সৃজনশীল কাজ ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠতে বাধ্য। ভাল সৃষ্টি কখনও কিলোগ্রাম ওজনে সমানে হয়ে যেতে পারে না। এই বোধটাই যেখানে উবে যায়, সেখানে কোনও উৎকৃষ্ট কাজই আর সম্ভব নয়।

সাংস্কৃতিক কাজকর্মের উৎকর্ষ নিয়ে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলি সত্যিই আদৌ চিন্তিত কিনা, নাকি তারা এই ধরনের কাজ ও সে কাজের কাজিদের নিজেদের দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার ও অপব্যবহার করতে চায়, তা আজও বুঝে উঠতে পারিনি। যা দেখা যায় বামপন্থীরাই সংস্কৃতির ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী। নব্বের দশকে শক্তিশালী বামপন্থী রাজনৈতিক দল জড়িয়ে পড়েছিল নতুন গানের দশকের ডামাডোলে। দস্তুরমতো দলাদলি, এ-শিবিরে ও-শিবিরে তিক্ততা, পত্রিকায় লেখালিখি, একজনের বিরুদ্ধে দল পাকানো, অস্বস্তিকর, দলীয় পোঁ ধরতে নারাজ এমন শিল্পী ও তাঁর গান নিয়ে কোনও কোনও কর্তাব্যক্তির উষ্মা, তাঁদের অনুগামী ও সমর্থকদের কাজে লাগানো, স্বাধীনচেতা, ধামা না ধরা ব্যক্তিটির এগনোর পথ আটকাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া— সবই চলতে থাকে বছরের পর বছর। সেই সঙ্গে চলে অপপ্রচার, ব্যক্তিগত কুৎসা রটানোর

সুপরিকল্পিত উদ্যোগ, যার রেশ এক যুগ পরে আজও রয়েছে।

বিচিত্র পথে এগিয়েছে বাংলা আধুনিক গান এই রাজ্যে। কার্যত, গুণমানের ধারাবাহিকতার অভাবে যথার্থর সঙ্গে স্থূল অনর্থ মিশিয়ে ফেলার অদ্ভুত আগ্রহে, পরিশীলিত ও আধুনিক সাঙ্গীতিক-কাব্যিক উক্তির বদলে ক্রমান্বয়ে বেশি মাত্রায় স্থূলতার বাহুল্যে (কারণ, ক্রমেই দেখা গেল পরিশীলন ও সূক্ষ্মতার চেয়ে স্থূলতাই বেশি হর্ষ জাগাতে পারে সংখ্যাগুরু অর্বাচীন শ্রোতাদের মধ্যে), স্বাভাবিকতা নামে জিনিসটি অতি আপত্তিকর জ্ঞানে নিরঙ্কুশ বর্জিত হওয়ায়, গানের উৎকর্ষের চেয়ে অন্যান্য বিষয় অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়ে যাওয়ায়, ক্যাসেটের যুগে যোগ্যতার কোনও মাপকাঠি আর না থাকায়, গানে ও সঙ্গীতে কোনওরকম শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই বেশ নাম করা যাবে, জলসায় ডাক পাওয়া যাবে, টাকাপয়সা হবে— এই ধারণা মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় এবং ওই ধারণার সত্যতা বাস্তবিকই প্রমাণিত হয়ে যাওয়ায় ক্রমাগত আরও বেশি সংখ্যায় নতুন গান (সত্যিই কি গান-পদবাচ্য?) ও রিমেক গানের ক্যাসেট বেরনোয় বাংলা আধুনিক গানের ক্ষেত্রটাই গেল আদ্যপ্রান্ত গুলিয়ে। অনেকদিন আগে গ্রুপ থিয়েটারের একটি নাটকের সংলাপে শুনেছিলাম: 'এ যেন বেনারসের রাস্তা। ষাঁড়ে-মানুষে-গোবরে-প্যাঁড়ায় লেপ্টালেপ্টি।' নয়ের দশকেই বাংলা আধুনিক গান যে রূপ নিতে শুরু করেছিল, সেটি এবং গানের সমকালীন ধ্বনি ও অবয়বের কথা ভাবলে ওই উপমাটাই খালি মাথায় আসে। গানবাজনা শিখে, গান লেখা ও সুর করার আগে প্রচুর গান ও বাজনা ভালমতো শুনে, নিজের ক্ষমতার মাপ নিয়ে, সবিনয়ে, গান রচনার নিরন্তর অনুশীলনে সামিল হয়ে একটু মনে রাখার মতো গান তৈরি করা ও গাওয়ার চেয়ে গানবাজনাকে হাতিয়ার করে নাম ও অর্থ উপার্জনের পথেই মন গেল চলে। বেচারা বাংলা গান আর কোন পথে যাবে, সেই পথেই গেল, ক্রমাগত যাচ্ছে।

নির্ঘণ্ট

গানের প্রথম লাইন/নাম

অনামিকা, চুপ	৬৭
আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী	৪১, ৪৩
আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়	৩৭
আমি ফুলকে যেদিন কেঁদেসেধে	২৪
আমি যায়ে চাই রে	৬৭
আমি এক যাযাবর	৭২
আমার গানের স্বরলিপি লেখা	৩৪, ৩৭
আমার এ বেভুল প্রাণের সঙ্গোপনে	৪০
আমার মা যখন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছ	৬৩
আমার প্রাণের রাধার কোন ঠিকানা	৩৯
আহা ঐ আঁকাবাঁকা পথ যায় সুদূরে	৩৮
** আহা যদি থাকতো তোমার ল্যাজের ওপর ডানা*	৯৩
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে	৪১
আঁধারে লেখে গান হাজার জোনাকি	২২
ইস্কুল খুইল্যাছে রে মওলা	৬৯
এমন দিনে তুমি মোর কাছে নাই	৩৮
এই নীলনির্জন সাগরে	৩৯
এক সেকেন্ডের নাই ভরসা	৬৯
এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার	৪৭, ৭১
এ কেমন রাত পোহাল দিন যদি আর	২৪, ৪৭
এ কেমন আকাশ দেখালে তুমি	৫৮, ৭৯

এই বেশ ভাল আছি ৮৪
একটি বালক ৮৯
ও ছোকরা চাঁদ ৯০
ও মাঝি ভাইও (নৌকা বাওয়ার গান) ২২, ৪১
ও আমার মনযমুনার অঙ্গে অঙ্গে ৩৮
ওরে সালেকা ওরে সালেকা ৬৭
ওরে ও মাঝি রাঙাস্বপন দেশে যাব ৪১
কত দূরে আর নিয়ে যাবে বলো ৩৪, ৩৭
কতটা পথ পেরলে তবে পথিক বলা যায় ২৫
কে তৈরি করেছিল তাজমহল ৫৮, ৮০
কিছু নেই তবু দিতে চাই ৪৬
কোনদিন গেছ কি হারিয়ে ৭৮
কে যায় সাথীহারা মরু সাহারায় ৩৭
কাঠফাটা রোদে পিচঢালা পথে ৩৭
কুচকুচে কালো সে যে জাতে স্প্যানিয়াল ৬১
কালকাটা নাইন্টিন ফর্টিথ্রি ৩৪
গড়িয়াহাটের মোড় ৮০
গন্ধবিচার ৪০
গঙ্গা বইছো কেন ৭১
গাঁয়ের বধূ ৪১
চল না দীঘার সৈকত ছেড়ে ৪৯
চেয়ে চেয়ে বসে থাকি ৪০
ছিপখান তিন দাঁড় ৪১
জোয়ারের গান ৪২
জানি পৃথিবী আমায় যাবে ভুলে ৪৯
জানি ভ্রমরা কেন কথা কয় না ৩৩
জয় বাংলা বাংলার জয় ৩৩
জীবননদীর জোয়ার ভাঁটায় কত ঢেউ ৩৭
জেগে আছি কারাগারে ৩৭
ঝাউয়ের পাতা ঝিরঝিরিয়ে ৩৪
ডিঙা ভাসাও ৮৯

তোমাকে চাই ৮০, ৮২, ৮৩, ৯৪
তুমি চিল হও ৮৬
তোমার জীবনে এলো কি আজ ৬৮
তোর কি কোনও তুলনা হয় ? ৬৩
তন্দ্রা এলো বলো জাগি কেমন করে ৩৭
তুমি কোথায় ছিলে অনন্য ৮৬
তোমার আমার স্বাধীনতা ৮০
তোমার সঙ্গে দেখা না হলে ৩৮
তিন শতকের শহর, তিন শতকের ধাঁধা ৮০
দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম ৪০
দূরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক ৪২
দূরালাপনী দ্বারা হল নবপরিচয় ৬৮
ধিতাং ধিতাং বোলে ৪২
ধান কাটার গান ৪১
পাল্কির গান ২২, ৪১, ৫০
পদ্মপাতায় রেখেছ আমার মনের সুধা ২৪
পথেয় এবার নামো সাথী ৪১
প্রান্তরের গান আমার ৪১
পথ হারাবো বলেই এবার ৪২
ফুলের মত ফুটলো ভোর ৪১
বলি ও আমার গোলাপবালা ৪৩
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ ৫৭
বাংলা আমার বাংলা ৫৭
বাবরের প্রার্থনা ৮৯
বাইরে খুব মেঘ করেছে ৯০
বেণীমাধব ৯০
বিজনের চায়ের কেবিন ৫৯
বুশি বল ৬১
ভালো লাগছে না, অসহ্য ঐ দিনকাল ৫৮, ৮০
মেঘ কালো আঁধার কালো ২২
মুক্তির মন্দির সোপান তলে ৩৭

মরণখেলার মাতনে আজ ৩৭
মানব না বন্ধনে ৫৭
মাগো বাংলা আর কতদিন ৫৭
মা আমায় বলেছে আমি নাকি বড় হয়েছি ৬১
মামুনিয়া ৬৯
মন শুধু ছুঁয়েছে ৬৯
মহীনের ঘোড়াগুলি ৭০
মঈনুদ্দিন কেমন আছ ৮৫
যদি কিছু আমারে শুধাও ৩৮
যে দোলায় দোলনচাঁপা ৪০
যে গানখানি শুনিয়ে যাই ৪৯
যে আকাশে ঝরে বাদল ৪৯
যদি না ভালবাসিতাম ৫৪
রোদে রাঙা ইটের পাঁজা ৪০
রানার ৫০
রেললাইনের ঐ বস্তিতে ৬৭
রাষ্ট্র মানেই কাঁটাতারে ঘেরা সীমান্ত ৮০
ল্যাজের ওপর ডানা ৯৩
লিটল বক্সেস ৬২
শোন বন্ধু শোন প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা ৩৯
শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি ৪১
শ্রীমতী যে কাঁদে ৪৬
শুনি তাক দুম তাক দুম ৫৮
সেই মেয়ে ২২, ৪১
সি আর পি মিলিটারি ৩৪
সুরের আকাশে তুমি যে গো ৩৯
সেই ভাল বসন্ত নয় এবার ফিরে ৩৮
সেই পাখি আজো আছে কি ৪০
সেই প্রথম সেই তো শেষ ৪৯
সাগর থেকে ফেরা ৫০
হাল ছেড়ো না বন্ধু ২৫
হায় চিল ৫০
হৃদয় কাদামাটির কোনও মূর্তি নয় ৬৯
হেই গো মা দুর্গা ৯০
Blues ৩৫
Give peace a chance ৩৫
Nobady knows the troubles l've seen ৩৫

নাম/বিষয়/সংস্থা

অতুলপ্রসাদ ৪৪
অলোকনাথ দে ২৫, ৪০, ৭৯
অজিত চট্টোপাধ্যায় ৪০
অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১, ৫০
অনিল বাগচী ২৫, ৪০, ৪৫
অজয় ভট্টাচার্য ৩৩, ৩৪, ৩৬
অনুপম ঘটক ২৫, ৩২, ৩৭, ৪৪
অনুপ মুখোপাধ্যায় ৬৩
অমিয় দাশগুপ্ত ৩৪, ৩৮, ৩৭
অর্গ্যান ৩২
অনুপ ঘোষাল ৪৯, ৫০
অংশুমান রায় ৫৭, ৫৮
অজয় চক্রবর্তী ৭২
অরুন্ধতী হোমচৌধুরি ৭২
অমিয় চট্টোপাধ্যায় ৭৯
অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় ৭৯
'অভিমানে অনুরাগে' ৮২
অঞ্জন দত্ত ৮৫, ৮৬

অরুণ মিত্র ৮৯
আন্দ্রেস সোগোভিয়ার ৬৭
আবদুল আহাদ ২৫
আবদুল লতিফ ২৫
আবদুল হালিম চৌধুরি ২৫
আলতাফ মামুদ ২৫
আনোয়ার পারভেজ ২৫, ৩৩
আলি আহমেদ হুসেন ৭৯
আলি হোসেন ২৫
আলি জাকের ৫০
আজাদ রহমান ২৫
আলম খান ২৫
আলাউদ্দিন আলি ২৫
আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল ২৫
আকাশবাণী ২৪, ২৫, ৩৯, ৪২, ৭৮
আলি আকবর খান ৪০
আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০
আরতি মুখোপাধ্যায় ৪৫, ৫০
আধুনিক গান ৪৮
আমীর খান ৪৯
আজম খান ৬৩, ৬৪, ৬৭, ৬৮
আল ডি মিয়োলা ৬৭
অ্যারেঞ্জার ৭৪
ইলেকট্রিক বেস গিটার ৩২
ইউরোপীয় বাঁশি ৩০
ইলা বসু ৫৪
ইন্দিরা গান্ধী ৫৮
ইন্দ্রজিৎ সেন ৫৯
ইন্দ্রনীল সেন ৫৯
ইন্দ্রনীল গুপ্ত ৮০
ইন্দ্রাণী সেন ৭২

ইন্টারভিউ ৫৩
উডি গাথরি ৩৫
উত্তমকুমার ৪৫
একর্ডিয়ান ৩২
একুস্টিক ডাবল বেস ৩২
এস এল দাস ৩১
এরিক ক্ল্যাপটন ৬৭
ও পি নাইয়ার ৫২
কাদের জামিরি ২৫
করিম সাহাবুদ্দিন ২৫
কাজী নজরুল ইসলাম ২৫, ২৭, ৪৪
কমল দাশগুপ্ত ২৫
কালীপদ সেন ২৫
কৃষ্ণচন্দ্র দে ৪৯
করবী নাথ ৫৭
কান ফ্রান্সিস ৬১
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার ৭২
ক্যাসেট ৭৩
কবিতা সিংহ ৭৯
কলকাতা উৎসব ৮১
কাজী কামাল নাসের ৮৬
কেশকার ৩৯
কোয়েলা ৩১
ক্লাসিক্যাল গিটার ৩২
খান আডাউর রহমান ২৫
খেয়াম ৫২
গোপাল দাশগুপ্ত ৪০, ৩৯, ৭৮
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৫৭, ৫৮, ৬১
গুপী গাইন বাঘা বাইন ৪৯
গৌতম চট্টোপাধ্যায় ৫৮
গৌতম নাহা ৫৯

চেলো ৩০
জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ২৪, ৩৪, ৩৮, ৪৭, ৪৮, ৪৯
জ্যাজ ৩২
জন লেনন ৩৫
জীবনানন্দ দাশ ৫০
জয়দেব ৫২
জোন বায়েজ ৬০
জন উইলিয়ামস ৬৭
জিঙ্গা ৬৮
জানে আলম ৬৯
জয় গোস্বামী ৯০
জীবনমুখী ৮৪, ৯৩
জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ২৫, ৩৯, ৪০, ৪৯, ৫০, ৭২
ডাবল বেস গিটার ৩২
ডাকহরকরা ৩৯
তসকানিনি ২৯
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯
তিমিরবরণ ৪০
তরুণ মজুমদার ৮২
দুনিচাঁদ বড়াল ৪০
দুর্গা সেন ২৫
দিলীপ সরকার ৩৭
দেবু ভট্টাচার্য ২৫
দক্ষিণামোহন ঠাকুর ৩৩
দিলরুবা ৩৩
দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ৪০
দ্বিজেন্দ্রলাল ৪৪
দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ৪৯
দেবব্রত বিশ্বাস ৭৬
দীপালি নাগ ৭৮
ধীর আলি মিঁয়া ২৫

নচিকেতা ঘোষ ২২, ২৫, ৪৫
নির্মল ভট্টাচার্য ৩৬
নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৯
নিখিল ঘোষ ৪০
নির্মলা মিশ্র ৪০
নিধুবাবু ৪৪
নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯
নীল দত্ত ৮৫
নজরুলগীতি ৫০
নৌসাদ ৫২
নাগরিক ৫৮, ৬২
নতুন গান ৯৩
নগর ফিলোমেল ৫৯
নচিকেতা চক্রবর্তী ৮৪, ৮৫
প্রিয়ব্রত ২২
পঙ্কজকুমার মল্লিক ২৫, ৩১, ৩২, ৫২
পরেশ ধর ২৫, ৩৪, ৪১, ৪২
পিয়ানো ৩২
প্রণব রায় ৩৩,৩৬
পবিত্র মিত্র ৩৩, ৩৬
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩, ৩৮
পিট সিগার ৩৫, ৬০, ৬২
প্রবীর মজুমদার ৩৯, ৪০
প্রসূন মিত্র ৩৯
প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩৯, ৭৮, ৫০
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০, ৫৩
পপ মিউজিক ৪৮
পিন্টু ভট্টাচার্য ৪৯, ৫০
পিক্কোলো ৩০
প্রতিদ্বন্দ্বী ৫৩
প্রতুল মুখোপাধ্যায় ৫৮, ৬৩, ৮৯, ৯০

প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯
পপ ৫৯, ৬৬
পল্লব কীর্তনিয়া ৮৮
পাগলা দাশু ৯৩
ফিরোজ সাই ৬৮
ফির'দৌস ওয়াহিদ ৬৯
ফণিবাবু ৭৯
ফিল অক্স ৬০
বেস গিটার ৩৩
বাণী কুমার ৩৩
বব ডিলান ৩৫, ৬০, ৬৭
বিটলস ৩৫, ৫৯
বিমলচন্দ্র ঘোষ ৩৯
বিশ্বজিৎ ৪৫
বিসমিল্লা খান ৪৯
বিলায়েৎ খান ৪৯
বাংলা পপ ৬১
বিমান ঘোষ ৬২
বিপুল চক্রবর্তী ৬৩
বিনয় চক্রবর্তী ৬৩
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৩
বাংলা রক ৬৩, ৬৬
ব্যান্ড ৬৮
বৃন্দসঙ্গীত দল ৭৮
বুলবুল সরকার ৭৯
বিজলীবাবু ৭৯
বড়ে গুলাম আলি খান ৮৭, ৮৯
বাংলা ব্যান্ড ৯৫
বাবাজি ৭৯
ভি বালসারা ২৫, ৪০, ৬১
ভূপেন হাজারিকা ২৫

ভল্‌ফ রিয়ারম্যান ৩৬
ভাস্কর বসু ৩৮
ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ৭২
ভয়েস অফ জার্মানি ৮০
মন্দ্রবাহার ৩১
মলয় মুখোপাধ্যায় ৪৬
মদনমোহন ৫২
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৫, ৩৯, ৪৫, ৭৬
মোহিনী চৌধুরি ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৩৯
মুকুল দত্ত ৩৪, ৩৮
মৃণাল সেন ৫৩
মান্না দে ৩৪, ৩৭, ৪৫, ৪৬, ৫৭
মহীনের ঘোড়াগুলি ৫৮, ৫৯
মৈজুদ্দিন ২৩
মিউজিক্যাল ব্যান্ডবক্স ৬১
মিউজিক ক্লাব ৭৮
মিঙ্গাস ডিনাস্টি ৩০
মানিক পাল ৭৯
মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯
মৌসুমী ভৌমিক ৮৬
ময়ূখ ও মৈনাক ৯০
যশোদাদুলাল মণ্ডল ৩৪, ৬৩
রবিন ঘোষ ২৫
রবীন চট্টোপাধ্যায় ২৫, ৩২, ৪৪
রবীন্দ্রনাথ ২৮, ৩৩, ৩৭, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৯৪
রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ ৪২, ৪৪
রাইচাঁদ বড়াল ২৫
রবিশঙ্কর ২৯, ৪৯
রম্যগীতি ৩৯
রজনীকান্ত ৪৪
রবীন্দ্রসঙ্গীত ৪৪

রওশন ৫২
রাগপ্রধান গান ৫০
রানু মুখোপাধ্যায় ৬১
রঞ্জনপ্রসাদ ৬২, ৬৩
রক ৬৩
রেনেসাঁ গোষ্ঠী ৬৯
রিমেক ৯৩
রিমেক-তারকা ৯৪
লেনার্ড কোহেন ৩৬, ৬০
লোকসঙ্গীত ৪৮
লঘুসঙ্গীত ৪৮
লিমবোরক ৫৪
লিডার মাখার ৬০
লন্ডন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা ৬০
লেনার্ড বার্নস্টিম ৬০
লতা মুঙ্গেশকার ৬২
লোপামুদ্রা মিত্র ৯০
শচীন দেববর্মণ ২৫, ৩৩, ৫২, ৫৮
শ্যামল মিত্র ২৫, ৪৫, ৫০, ৭২
শৈলেন মুখোপাধ্যায় ২৫
শৈলেন রায় ৩৬
শ্যামল গুপ্ত ৩৭
শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮
শিপ্রা বসু ৫০
শঙ্কর জয়কিষন ৫২
শহীদ কাদরি ৫৮, ৮০
শুবার্ট ৬০
শ্রাবন্তী মজুমদার ৬১
শিবাজী চট্টোপাধ্যায় ৭২
শ্যামল বসু ৭৯
শুভেন্দু মাইতি ৮৫

শিলাজিৎ ৮৮
শঙ্খ ঘোষ ৮৯
শ্রীকান্ত আচার্য ৯৪
শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭২
সলিল চৌধুরি ২২, ২৫, ৩৪, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৭, ৫৮, ৬২
সবিতা চৌধুরি ২২, ৫৭
সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ২৪, ২৫, ৩৭,
সমর দাস ২৫
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ২২, ৪১, ৪৯, ৫০
সত্য সাহা ২৫
সরোজ দত্ত ৩৯
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ৪৫, ৫০, ৬২, ৮৭
সত্যজিৎ রায় ৪৯, ৫৩
সং রাইটার ৫৯
সোলস ৬৯
সাবিনা ইয়াসমিন ৭৬
সি ট্রাম্পেট ৩০
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮৫
সোনার বাংলা ৮৬
সুচিত্রা মিত্র ২২
সুবল দাস ২৫
সুধীরলাল চক্রবর্তী ২৫, ৪৪
সুধীন দাশগুপ্ত ২৫, ৩৯, ৪৫, ৪৯, ৫০
সুবোধ পুরকায়স্থ ৩৩, ৩৬
সুগম সঙ্গীত ৩৯
সুরেন পাল ৪০
সুকুমার রায় ৪০, ৪১, ৯৩,
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৪৫
সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭
সুকান্ত ভট্টাচার্য ৪৯, ৫০

সুজিত নাথ ৫৭
সৈকত মিত্র ৭২
সমীর চট্টোপাধ্যায় ৯০
স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত ৯০
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ২২, ২৫, ৪২, ৪৫, ৫০, ৭২
হেমন্ত মঞ্চ ৮১
হার্প সিকর্ড ৩২
হীরেন বসু ৩৩, ৩৬
হিমাংশু দত্ত ৪৪, ৪৫
হৈমন্তী শুক্লা ৫০
হান্‌স ভেরনার হেনৎসে ৫৬
হেগেল ৬১
হর্ষ দাশগুপ্ত ৬২
Blues ৩৫
Jazz ৩০, ৩৪, ৩৫

আধুনিক বাংলা গানের কোনও বিস্তৃত ইতিহাস বা সার্থক কালোত্তীর্ণ গবেষণা গ্রন্থ আজও লেখা হয়নি। অথচ আত্মপ্রকাশের কাল নিয়ে সামান্য বিতর্ক থাকলেও জনপ্রিয়তম এই বাংলা গানের বয়স পঁচাত্তর পেরিয়ে গেছে। 'কোন পথে গেল গান' কোনও অর্থেই আধুনিক বাংলা গানের ইতিহাস নয়, গবেষণা গ্রন্থ তো নয়ই। বাংলাগানের একজন সার্থক পথযাত্রী হিসেবে লেখক তাঁর স্মৃতিকথার মোড়কে ছুঁয়ে গেছেন আধুনিক বাংলা গানের ঐতিহ্য-রঙিন পথ। লেখার টানে সেখানে হাজির স্মরণীয় সুরকার, গীতিকার এবং স্বনামধন্য শিল্পীরা। সঙ্গীত সৃষ্টির পথের নানা বৈচিত্র্য ছাড়া আছে অভিজ্ঞ সঙ্গীত-ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর নিজস্ব মতামত। সঙ্গীতের রসজ্ঞ শ্রোতা-পাঠকরা হয়ত পেয়ে যাবেন আলোচনার অনেক খোরাক। তাঁদের এমন কথাও মনে হতে পারে, অন্তত একজন স্রষ্টা নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করলেন বাংলা গান দশক-শতাব্দী পেরিয়ে কোন দূরের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

একদা সুমন চট্টোপাধ্যায় প্রধানত নিজের জীবনকথা নিয়ে লিখেছিলেন 'হয়ে ওঠা গান'। বাংলা গানে আজও আচ্ছন্ন থেকে এবার কবীর সুমন লিখলেন 'কোন পথে গেল গান'।

গায়নশৈলীতে গত শতাব্দীর নব্বই দশকের শুরুতে আধুনিক বাংলা গানের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন কবির সুমন (তখন সুমন চট্টোপাধ্যায়)। শুধু শিল্পী হিসেবেই নয়, বাংলা গানের একজন যথার্থ আধুনিক মনস্ক গীতিকার-সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশেই ছিলেন প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠায় উজ্জ্বল। আশৈশব সাঙ্গীতিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠার সুবাদে বাংলা গানের সঙ্গে তাঁর বর্ণপরিচয় ঘটেছিল বেঁচে থাকার পথে হাঁটতে হাঁটতেই। প্রথাগত সঙ্গীতশিক্ষার শুরু পিতা সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। পরবর্তীকালে শিক্ষক ছিলেন কালীপদ দাস, নীহারবিন্দু সেন, নিখিলচন্দ্র সেন ও মণি চক্রবর্তী। নানাভাবে সাময়িক তালিম পেয়েছিলেন সঙ্গীতাচার্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, পঙ্কজকুমার মল্লিক, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুবিনয় রায়ের কাছেও। বিদেশে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বৈচিত্র্যময় পাঠ নিয়েছিলেন নানা দেশের নানা শহরে। জার্মানির কোলোন-এ এক ইতালীয় গুরুর কাছে ক্লাসিক্যাল গিটারের পাঠে সেই শিক্ষার শুরু। সঙ্গীতের নানা যন্ত্রের যন্ত্রী কবীর সুমন কথা-সুর-গায়কী নিয়ে বাংলা গানের এক প্রাণবন্ত, দিব্য প্রতিষ্ঠান। বাংলা গানের সঙ্গে জড়িত পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তিনি যথার্থ অর্থেই পথপ্রদর্শক।